

# অফুলিঙ্গ

২০১৭



বিবেকানন্দ কলেজ বার্ষিক পত্রিকা

# স্বলিঙ্গ

২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপিকা সুতপা ভট্টাচার্য

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, পত্রিকা বিভাগ

ছাত্র সংসদ

সম্পাদক

সৌম্যজিৎ চেল

সম্পাদক, পত্রিকা বিভাগ

ছাত্র সংসদ

প্রচ্ছদ বিন্যাস

শ্রী শিবশঙ্কর দত্ত

শিক্ষাকর্মী

## সূচীপত্র

সভাপতির শুভেচ্ছা	শোভন চট্টোপাধ্যায়	৫
অধ্যক্ষের শুভেচ্ছা	ডঃ তপন কুমার পোদ্দার	৭
খোলা চিঠি	সৌম্যজিৎ চেল	৯
চোখের জল	শুভজিৎ দাস	১১
ধ্বংসাত্মক উড়ালপুল	রিমা নস্কর	১২
হতো যদি	রিম্পা মণ্ডল	১২
বন্ধুত্ব	রিমা নস্কর	১৩
কলমবন্ধু	সায়ন দে	১৩
চিরায়ত	পৃথা কাঞ্জিওয়াল	১৪
বাতিখানি নিভে গেছে	সম্পূর্ণা চক্রবর্তী	১৪
অস্তুহীন জীবন	শুভম মালিক	১৫
শহুরে রোগ	নীলপর্ণ ব্যানার্জী	১৫
মেঘের বাণী	শুভম মালিক	১৬
শৈশব চুরি	প্রিয়াসা পাত্র	১৭
শরৎকাল	সুদীপ্তা হালদার	১৭
অস্তরের পথে	হাবিবুল রহমান সেখ	১৮
দূরবীন	শীর্ষা চ্যাটার্জী	১৮
বর্ষা	সুমন মণ্ডল	১৯
মনে পড়ে	অনীক বসু	১৯
অনুভব	বন্দনা বসু ভৌমিক	২০
Ageless	Saikat Pradhan	২০
Proud Summer	Rima naskar	২২
The Street Lights	Sanchayan Khamaru	২২
Success	Atrimay Saha	২৩
Fibonacci Numbers in Nature	Sukanya Ghosh	২৪
শেষ অঞ্জলী	বিতান চন্দ্র ঘোষ	২৫
সরষেতে ভূত	সুমন মণ্ডল	২৭
কর্তব্য	শুভাশিস ব্যানার্জী	৩১
ক্ষুধা	গার্গী ভান্ডারী	৩৩
ভ্রমণ কাহিনী : মরুতীর্থ পুষ্কর	সায়ন দে	৩৫
Hawking-A Non-Renewable Diamond Artist	Ahindra Kr. Biswas	৩৬
মাতৃভাষায় বাঙালির অরুচি	শুভাশিস ব্যানার্জী	৩৯
কার্ল মার্কস-শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম	বাংলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ	৪২
ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান	তীর্থরাজ সরকার	৪৫
বিরহের কাব্য মেঘদূতম্	মণীষা মণ্ডল	৪৭



Sovan Chatterjee  
Mayor

THE KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION

Central Municipal Building

5, S. N. Banerjee Road,  
Kolkata - 700 013

Telephone : 2286-1211/1111

2286-1000 (Extn. - 2471)

Fax : 0091-33-2286-1311

web L: www.kmccgov.in

e-mail : sovan63@yahoo.co.in

mayor@kmccgov.in

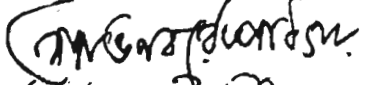
তারিখ : ০২/০৯/২০১৭

## সভাপতির শুভেচ্ছা

বিবেকানন্দ কলেজ বেহালা-ঠাকুরপুর অঞ্চলের একটি অন্যতম প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আমি এই কলেজের সভাপতি হতে পেরে অত্যন্ত গর্ববোধ করছি। এই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুগ্ম সকলের জন্য অন্তরের শুভেচ্ছা রইলো।

এই কলেজে যারা শিক্ষার্থী হওয়ার সুযোগ পেল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা এই কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকমণ্ডলীর স্নেহ সাহচর্যে ও শুভাবধানে প্রকৃষ্ট শিক্ষালাভ করে নিজেদের জীবন সম্বল করে তুলবে এবং কলেজকে গৌরবান্বিত করবে। তাদের সকলের জন্য আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ রইলো।

স্কুলিং এই কলেজের ছাত্রসংসদ পরিচালিত বার্ষিক পরিষদ। আমি এই পরিষদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ছাত্রদের সৃজনশীলতার সাক্ষর বহন করে স্কুলিং চিরভাস্বর হয়ে উঠুক - এই শুভেচ্ছা রইলো।

  
(সভাপতি)

মহানগরিক

বেঙ্গলগাঙ্গা পৌরসভা

## অধ্যক্ষের শুভেচ্ছা

বিবেকানন্দ কলেজের ছাত্র সংসদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও সুচিন্তার অন্যতম ফসল ‘স্ফুলিঙ্গ’। ছাত্র-ছাত্রীদের অবচেতন মনের গভীরে সর্বদা যে রঙ্গীন স্বপ্নের আনাগোনা, তার বাহ্যিক প্রকাশের স্থান এই পত্রিকা। আজকের এই নবীন কিশোর মনের লেখক বা লেখিকা হয়ত একদিন জগৎসভার শ্রেষ্ঠ আসনের দাবীদার হবে। তাকে এই শুভ সূচনার সুযোগ দেওয়ার জন্য ছাত্র সংসদের ভারপ্রাপ্ত সদস্যদের প্রশংসা অবশ্যই প্রাপ্য। ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপিকা ডঃ সুতপা ভট্টাচার্যকে, যিনি অভিভাবক হিসাবে এই পত্রিকা প্রকাশনায় উদ্যমী। ‘স্ফুলিঙ্গ’ পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও কলেবর বৃদ্ধির কামনা করি।

শুভেচ্ছান্তে

তপন কুমার পোদদার

অধ্যক্ষ,

বিবেকানন্দ কলেজ

ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬৩

## খোলাচিঠি

আগামীর জন্য রেখে যাওয়া বার্তায় বলে যাই কিছু কথা। ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিবেকানন্দ কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হই। সাধারণ সম্পাদক পদে পর পর দু'বছর এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা অসুবিধা দেখার পাশাপাশি কলেজের যাবতীয় উন্নয়ন মূলক কাজে অধ্যক্ষ এবং কলেজ পরিচালন সমিতির সাথে কলেজ ছাত্র সংসদ এগিয়ে এসেছে। গোটা রাজ্য জুড়ে কলেজগুলিতে যখন বিভিন্ন বিষয়ে উত্তাল তখন আমাদের কলেজ যে অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম তা সম্ভব হয়েছে আমাদের অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্কের জন্য। কলেজ আমাদের, আমাদের জন্য কলেজের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক। NAAC এর অনুমোদনে কলেজ আমাদের “A”। কলেজের গর্বে আমরা গর্বিত এই কলেজের ছাত্র হিসাবে। এরই মধ্যে “সফুলিঙ্গ” হয়ে উঠেছে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্র। আশা রাখব আগামী দিনে প্রতিটি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা এই ম্যাগাজিনকে আপন করে নিক।

ধন্যবাদ জানাই কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শোভন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, অধ্যক্ষ ডঃ তপন কুমার পোদ্দার মহাশয়, কলেজ পরিচালন সমিতির সভ্যগণ, অধ্যাপক অধ্যাপিকা, ছাত্র সংসদের অন্যান্য সভ্যগণ, অশিক্ষক কর্মী এবং সর্বোপরি কলেজের সকল ছাত্রছাত্রীদের। আগামী দিনে কলেজ তার সুখ্যাতি এইভাবে ধরে রাখুক। যে হৃদয়তা ছাত্র-অধ্যাপকদের মাঝে রয়েছে তা অক্ষত থাকুক।

নমস্কারান্তে-

সৌম্যজিৎ চেল

সাধারণ সম্পাদক

ছাত্র সংসদ, বিবেকানন্দ কলেজ

ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬৩

# চোখের জল

শুভজিৎ দাস

বি.এস.সি. (অনার্স), প্রথম বর্ষ

যদি কোনো ভোরে হঠাৎ তোর ফোন বেজে উঠল  
আর তোলা মাত্রই ওপাশ থেকে তোর বন্ধু জানালো  
আমি আর নেই, কাল রাতেই.....।

কী করবি তুই ?

দু-ফোঁটা চোখের জল বরাদ্দ থাকবে তো ?

সেদিন তুই থাকবি,

কিন্তু চিরবিদায় নেব আমি ।

তোর দু-নয়ন হতে অশ্রু ঝরবে,

কিন্তু মুছবো না তো আমি ।

হয়তো সেদিন আমার শোকে

করবি তুই কতবার চিৎকার,

কিন্তু দেব না তো সাড়া আমি আর ।

হয়তো সেদিন বসে বসে

একলা গৃহের কোন এক কোণে

ফেলবি শুধু চোখের জল

থাকবি বসে একলা মনে ।

পড়বে কি তখন আমায় মনে ?

ধর একদিন আমার খোঁজে

এসে পড়লি আমারই বাড়িতে

দেখলি সামনে একটা আমার বড় ছবি -

আর ছবিতে আছে আমার প্রিয় ভুঁইমালা

কী করবি তুই তখন শুনি ?

তোর দু-চোখ থেকে জল পড়বে তো ?

দেখবি রাতে স্বপ্ন আমার

বসে আছি একে বারে পাশে তোর

‘শুভ’ বলে উঠবি জেগে ।

থাকবো না তো তোর সাথে

দেখতে তুই পাবি না তো আমাকে

দেখবি শুধু চারিদিকে আঁধার - আর

চারিদিকে ছেয়ে গেছে নিঃসঙ্গতা ।

একবার বাইরে এসে দেখবি

দেখতে পাবি আঁধার মাঝে

একলা কেবল দাঁড়িয়ে আছি

শত শত তারার মাঝে ।

তখন আমায় চিনতে পারবি তো ?

আর তারা গুনতে গুনতে কোন একদিন,

সবচেয়ে বড় তারায়

যদি আমার অস্তিত্ব খুঁজে পাস

কী করবি তখন শুনি ?

তোর নিষ্পাপ চোখ থেকে জল ঝরবে তো ?

চোখের জল এত সস্তার নয়

যখন তখন খরচ নয়।

এত যে অপচয় করিস

ঠিক সময় এলে যোগান দিতে পারবি তো ?

“যাহার যোগ্যতা যত অল্প তাহার অহংকার তত বেশী।”

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# ধ্বংসাত্মক উড়ালপুল

রিমা নস্কর

বি.এ. ইংরাজী (অনার্স), প্রথম

বর্ষ

বিবেকানন্দ উড়ালপুল,

হঠাৎই ভেঙে পড়েছে !

অনেক মানুষ

মারা গিয়েছে

কত না বৃদ্ধ, কত না শিশু

আহত হয়েছে ।

চাপা পড়া অবস্থাতেও

কেউবা বাঁচার চেষ্টা করেছে

বহুজন সাহায্য আর জল চেয়েছে ।

বেরিয়ে এসেছে তাদের বুকফাটা গোঙানি,

এমন ধ্বংসাত্মক ঘটনা বোধহয় আগে দেখিনি,

কত না পরিবার তাদের স্বজন হারালো,

কাদের ভুলে জন্য আজ

হাজার হাজার মানুষকে মাশুল দিতে হল ?

“যখন তোমার পকেট ভর্তি টাকা থাকবে, তখন শুধু তুমি  
ভুলে যাবে যে, ‘তুমি কে !’ কিন্তু যখন তোমার পকেট ফাঁকা  
থাকবে, তখন সমস্ত দুনিয়া ভুলে যাবে যে, তুমি কে ?”

-বিল গেটস।

## হতো যদি

রিম্পা মণ্ডল

বি.এ. বাংলা (অনার্স), প্রথম বর্ষ

বড়ো হচ্ছি বুঝতে পারছি

আমি নাকি কলেজ যাচ্ছি !

ভাবতে খুবই লাগছে অবাক

মাঝে মাঝে হই হতবাক ।

ছোটবেলায় বাপির সাইকেল চড়ে

প্রথম আমার স্কুলে পা পড়ে ।

কি করে এত বড়ো হলাম !

নতুন জীবনে পা দিলাম ।

হঠাৎ করে এই কলেজ-লাইফ !

মিলছে নাকো স্কুল-লাইফ

ছন্নছাড়া লাগছে কেমন

বেশ তো ছিল স্কুল জীবন ।

কেন যে সবাই কলেজ আসে

ভরতি হয় অনার্স, পাশে ?

ছোট্ট ছিলাম বেশ তো ছিলাম

দূর ! কেন যে হলাম বড়,

পারলে কেউ ছোট হবার

মন্ত্র সৃষ্টি করো ।



## বন্ধুত্ব

রিমা নস্কর

বি.এ. ইংরাজী (অনার্স), প্রথম বর্ষ

বন্ধুত্ব মানে,

খানিকটা ভালোবাসা।

বন্ধুত্ব মানে,

একসাথে যাওয়া-আসা।

বন্ধুত্ব মানে,

খুব করে কথা বলা।

বন্ধুত্ব মানে,

এক সাথে পথ চলা।

বন্ধুত্ব মানে,

আড্ডা আর গল্প।

বন্ধুত্ব মানে,

খুনসুটি অল্প।

বন্ধুত্ব মানে,

একসাথে খাওয়া-দাওয়া।

বন্ধুত্ব মানে,

বন্ধুদের বাড়ি যাওয়া।

বন্ধুত্ব মানে,

বসা শুধু পাশাপাশি।

বন্ধুত্ব মানে

ঠাট্টা আর হাসাহাসি।

বন্ধুত্ব মানে,

খানিকটা রাগারাগি।

বন্ধুত্ব মানে,

কখনও ভাব কখনও আড়ি।

বন্ধুত্ব মানে,

সুখে ভরা জীবন।

বন্ধুত্ব মানে,

বন্ধুরাই আপন।

## কলমবন্ধু

সায়ন দে

বি.এ. ইংরাজী (অনার্স), দ্বিতীয় বর্ষ

কলমবন্ধু চিঠি লেখে মাঝে-মাঝে

দুপুরের ডাকে অধীর প্রতীক্ষা...

বুকের মধ্যে তুমুল বৃষ্টি নামে

কখনও মেঘ কখনও হিমেল হাওয়া।

আমরা আসলে ভীষণ সবাই একা,

খোপের ভেতরে অণু পরিবারগুলি

টিভি সিরিয়ালে ক্লান্ত চোখের পাতা

খুন হয়ে যায় টুকরো টুকরো কথা।

ফেসবুক আর ই-মেলের ব্যবহারে

চোখ ধাঁধানো বিশ্বায়নের স্রোতে

জেট যুগের নাগরিক হতে গিয়ে

হেঁচট খেয়েছি শুধু বারে বারে।

সুখ দুঃখের স্মৃতিময় ব্যথা ছুঁয়ে

চির চেনা সাথী অচেনাই থেকে যায়

কলমবন্ধু লিখি মাঝে মাঝে

আমার আকাশের রামধনু ভেসে ওঠে।

“অনেক শক্তিমান হাল ছেড়ে দেয়,

হার মানে বহু দ্রুতগামী

জীবনযুদ্ধে শুধু তারাই জেতে

যারা ভাবে জিতবই আমি।”

- স্বামী বিবেকানন্দ

## চিরায়ত

পৃথা কাজিওয়াল  
বি.এ. সাংবাদিকতা এবং গণজাপন বিভাগ  
(অনার্স), প্রথম বর্ষ

প্রতিবারের মত এবারেও উমা  
আসছে বাপের বাড়িতে।  
তাই প্রচন্ড ব্যস্ততা পোটো পাড়ায়।  
কাঠামো বাঁধা শেষ,  
শেষ খড় বাঁধাও,  
এমনকি সম্পন্ন হয়েছে মাটির প্রলেপ।  
তাই এখন পোটোরা একটা নিশ্চিত্তে।  
আবার শুরু হবে ছড়োছড়ি মহালয়া থেকে,  
কারণ সেদিন থেকে শুরু হবে চক্ষুদান।  
নির্দিষ্ট দিনে মা পাড়ি দেবেন বিভিন্ন অঞ্চলে  
পোটোকে কাঁদিয়ে।  
এতোদিন ধরে একটু একটু করে লালন পালন করে  
কন্যাকে তুলে দেবে আমাদের হাতে।  
আমরা হাসতে হাসতে গ্রহণ করব মাকে।  
দিন চারেক পর আমরা কাঁদতে কাঁদতে  
বিদায় জানাবো মাকে,  
সেদিন হেসে উঠবে সেই পোটোরা,  
ফেলে দেওয়া পুতুলকে তুলে নেবে জল থেকে,  
আবার হবে শব ব্যবচ্ছেদ,  
তেরী হবে মা মহাশক্তি।

## বাতিখানি নিভে গেছে

সম্পূর্ণা চক্রবর্তী  
বি.এ. বাংলা (অনার্স), প্রথম বর্ষ

বাতিখানি জ্বলেছিল,  
অনেক খুঁজে অবশেষে  
ঠাকুরঘরের ভাঙা সিংহাসনের পাশে -  
একটি বাতি খুঁজে পাওয়া গেছিল।  
জ্বলন্ত দেশলাইয়ের ছোঁয়ায়  
সে-ও জ্বলে উঠেছিল।  
সকল প্রাপ্ত যখন ঘোর তমশা -  
তখন বাতিটি জ্বলে উঠে  
ঘরের একটি কোণ আলোকিত করেছিল।  
বাতিখানা নিভে গেছে।  
উত্তরের জানলাটা ছিল খোলা -  
বর্ষার ঝোড়ো বাতাস এসে  
এক নিমেষে  
আছড়ে পড়ল বাতিটার উপর।  
বাতিখানা নিভে গেছে।  
বাতিটা চেয়েছিল এই ক্লেদান্ত নোংরা  
সমাজের  
নিকষ কালো বুকে  
একটু আলো কুড়োতে,  
কিন্তু সমাজের জানলা ছিল খোলা,  
তাই উত্তরের নির্মম বাতাসে  
সে নিভে গেছে।  
কিন্তু তার আলোর রেশটুকু -  
সমাজের বুকে রেখে  
বাতিখানা নিভে গেছে।

# অন্তহীন জীবন

শুভম মালিক

বি.এস.সি. পদার্থবিদ্যা (অনাস), দ্বিতীয় বর্ষ

দশমীর রাত, কলমের তলায় আলোতে ছোঁয়া হাত,  
মাকে বিদায় জানাবার পর বিষন্নতার অন্ধকার যেন  
ডানা মেলে হাজির।

তারই সঙ্ক্ষিপ্তে কখন যে কলমটা পাতা স্পর্শ করেছে,  
তার খেয়াল নেই।

মাঝে মাঝে ভাবি জীবনটা রয়েছে এক ঘেরাটোপে বাঁধা,  
বাঁধনটা শক্ত করে ধরে আছে কোনো এক অদৃষ্ট শক্তি।  
কষ্ট হয়, তবু সামলে নি, কষ্টটার কাছে আবার কখনও  
মাথাটা নোয়াতে হয়।

ভাবলে মনে হয় বড় তো হয়েছি, কিন্তু বড়ো হওয়ার  
মর্ম কি বুঝেছি!

আঠারোটা বসন্ত পেরিয়ে এলাম -  
কটা ফুল ফোটাতে পেরেছি আর কটা পারিনি -  
তার হিসেব মেলাতে গেলে হতাশা গ্রাস করে।  
এই মায়াবী জাল থেকে বেরোনো খুবই কষ্টকর।  
সেটা এখন বোধগম্য হচ্ছে।

কিন্তু এটা বুঝিনি যে কাজ করার জন্য  
বেঁচে আছি, না বাঁচার জন্য কাজ করছি।  
বহু অমাবস্যা পূর্ণিমা পেরিয়ে, এগিয়ে  
চলেছি পৃথিবীর নিয়মে।

জানি পথটা বন্ধুর না মধুর;  
জানি এ পথে পৌঁছতে পারব কিনা!  
শুধু জানি এগিয়ে যেতে হবে এই রাজপথ দিয়েই  
এগিয়ে যাবো, তাই আমি এগিয়েই যাবো.....।

## শহুরে রোগ

নীলর্পণ ব্যানার্জী

বি.এস.সি. রাশিবিজ্ঞান, ২য় বর্ষ

অতীত ঘেঁটে দাঁড়াও যেথায় -  
ভুলের মাত্রা লাগাম ছাড়া,  
তোমরা শুধু রাস্তা পাল্টাও  
বদলাও না চেহারাটা।

গোপন চেষ্টা করছ কত -  
শব্দ দূষণ মনের ডগায়  
আমরা যেটাকে খরচ বলি,  
তোমরা সেটাকে বলছ ব্যয়।

তফাত কি? আলেয়া, ঝড়ে -  
হাত ভেজানো গল্প বলো  
আতশ কাঁচে আগুন পেলে  
তোমরা ফের ভুলটা ধরো।  
হোঁচট খাওয়া অপরাধ নয়  
হিংসে করো সব শেষে  
রাংতাটাকেই আসল ভাবো  
পাল্টাও পথ নির্দেশে।

তোমাদের চোখে জ্বলছে যত সভ্যতার আলো  
আমাদের খারাপ মুখে বলছি শোনো  
অন্ধকারই বড়ো ভালো।

# মেঘের বাণী

শুভম মালিক

বি.এস.সি. পদার্থবিদ্যা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

মেঘ তুমি কার ???  
বৃষ্টি বলল, মেঘ তো আমার -  
মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতেই তো ভিজে চলে ব্যাকুল দুটি মন  
শরৎ বলল, না না, তা হয়না,  
মেঘ আমার, শুধুই আমার,  
শরতের পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘমালাই যে  
কাশফুল দুলিয়ে বাঙালীর সেরা পূজোর আগমনী ঘন্টা বাজায়।  
পর্বত বলল, ওসব জানিনা, মেঘ আমার আমার আমার !!!  
আমি না থাকলে, মেঘ বুঝি পেত না  
দুহাতের স্পর্শ.....  
আকাশ বলল, আমার হৃদয়েই তো মেঘের বাস,  
আমি না থাকলে, কেউ দেখতে পেতনা মেঘের হুলাহাটি  
কেউ বুঝত না তার হালকা অভিমানী হালকা খোশমেজাজী মন।  
তাই মেঘ আর কারোর নয়, মেঘ আমারই।

মেঘ বলল, আমি যে সবারই অন্তর্ভাগি  
মেঘ বলে ডাকো যদি,  
আমি শিখর হতে শিখরে ছুটব,  
আমি গগন হৃদয় চিরে ঝরে পড়ব ঝিমঝিম ধারায়।  
মেঘ তুমি মোর সাঁঝের মেঘমালা  
মোর ভোরের মেঘলা হাওয়া,  
কোনো একদিন কোন এক আনমনা হিমেল হাওয়া  
চিনিয়ে দেয় তোমার অভিমানী মনটাকে।  
আকাশ পানে চেয়েছিলে  
দুটি লাজুক নয়ন মেলে।  
সে স্মৃতি মুছে গেছে বেখেয়ালী ইতিহাসের  
তবু সম্পর্ক লুকিয়ে আছে মনের অন্তরালে।  
বহুকাল পরে আজও,  
আকাশ পানে চেয়ে প্রশ্ন করি,  
উত্তর আসে, মেঘ বলে ডাকো যদি... !!!  
মেঘ বলে ডাকবো বলে আজও অপেক্ষায়.....।

## শৈশব চুরি

প্রিয়াসা পাত্র, বি.এ. সংস্কৃত বিভাগ, প্রথম বর্ষ

দশ বছরের ছোট্ট কুসুম  
পড়াশোনায় রত,  
এবার যাবে হাইস্কুলে  
স্বপ্ন যে তার কত।  
মা হঠাৎ বলল তারে  
পড়াশোনার ইতি;  
এবার তোর বিয়ে দিলে  
পরকালের গলি।  
বলল মেয়ে পায়ে পড়ি মা  
দিও না মোর বিয়ে,  
পড়াশোনা করে চাকরি করব  
আমি বড় হয়ে।  
বাবা বলে মেয়েমানুষের  
কীসের এত পড়া;  
সেই তো যাবি পরের ঘরে  
বৃথাই খরচ করা।  
শুনলা না কেউ, বুঝলো নাকো  
ছোট্ট মেয়ের ব্যথা,  
দুদিন পরে দেখাশুনা  
বিয়ের পাকা কথা।  
পাত্রপক্ষ চাইল অনেক  
সোনা, দানা, পণ;  
বেচল বাবা জমিজমা  
রাখতে তাদের মন।  
রাঙা চেলি চন্দন পড়ে  
চলল মেয়ে স্বশুর ঘরে,  
ছোট্ট কুসুম ফোটোর আগে  
কুড়িতেই বুঝি গেল ঝরে,  
স্বপ্ন ঘেরা শৈশব চুরি  
এ কেমন পুতুল বিয়ে?  
বন্ধ হোক এই ছিনিমিনি খেলা  
ছোট্ট শিশুর স্বপ্ন নিয়ে।

## শরৎকাল

সুদীপ্তা হালদার

বি.এ. সংস্কৃত বিভাগ, প্রথম বর্ষ

এসেছে শরৎ জাগছে মনে আশা,  
আসবে পূজো, মত্ত হবে পাড়া।  
মগ্ন হয়েছে শিউলির গন্ধে বাতাস,  
হালকা মেঘে হাসছে যেন আকাশ।  
দুলছে দেখো ঐ সে কাশের বন,  
হালকা শিশিরে ভরছে সবার মন।  
মত্ত হয়েছে ঢাকিরা বাজাতে ঢাক,  
মা আসছে! মা আসছে!  
তাই করছে সবাই হাঁক ডাক।  
হয়েছে খুশি শিশুরা পেয়ে নুতন জামা,  
হচ্ছে খুশি তারাও যারা দিচ্ছে এখন হামা।  
অশ্রু ঝড়ে পড়বে মায়ের চলে যাবার দিন  
ফুরাবে না মায়ের কাছে কখনও আমাদের ঋণ।

“স্বপ্ন সেটা নয় যেটা মানুষ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন  
সেটাই - যেটা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয়  
না।”

-এ. পি. জে. আবদুল কালাম

## অন্তরের পথে

হাবিবুল রহমান সেখ  
বি.এ., ইতিহাস, তৃতীয় বর্ষ

এই জীবন মাত্র একবারই  
আসবে না ফিরে আর  
তাই হাজার বার ভুল করলে  
নিজেরা নিজেদের ঠকাবো।  
সামান্য লোভের কাবর্তী হয়ে  
প্রবৃত্তির ফাঁদে  
জীবনকে ফাঁকি দেবে কেন ?  
ব্যর্থ করবে কেন ?  
ধরো সারাদিনে  
খামোখা দশবারোটা  
মিথ্যে কথা বলি,  
প্রতিশ্রুতি বিলাই-  
অথচ, এগুলি এড়িয়ে চলে  
সৎ হতে পারি...  
মিথ্যে স্বপ্ন দেখা নয়,  
এসে নিজেকে নিজেকে  
বাঁচতে হবে মানুষ হয়েই  
পরিশুদ্ধ হয়েই  
অনন্তের পথে  
অগ্রসর হয়।

## দূরবীন

শীর্ষা চ্যাটার্জী  
বি.এস.সি., রাশিবিজ্ঞান (অনার্স) প্রথম বর্ষ

জীবনের এক নতুন অধ্যায়  
নতুন স্বপ্ন নতুন সজ্জায়,  
স্কুল জীবনের বন্ধ নিয়ম  
ফেলে আসা কৈশোরের জীবন-  
আজকে সামনে মুক্ত আকাশ  
রঙিন স্বপ্নে যৌবনের অবকাশ  
তবুও কখনো স্মৃতির ভিড়ে  
পড়বে মনে বারে বারে  
স্কুল জীবনের অমূল্য দিন  
ছেলেমানুষি ও আড্ডায় বিলীন।  
যৌবনের অবকাশের মাঝে  
বন্ধুত্বের নতুন খোঁজে,  
আজকে সওয়ার এক প্রজন্ম  
ভবিষ্যৎ-এর সুপ্ত স্বপ্ন।  
সে স্বপ্নের প্রস্ফুটিত রূপ  
তৈরী করবে দেশের স্বরূপ  
যৌবনের এই নববেশ।  
কিছু মুহূর্তের অলীক আবেশ  
আবার মিশেবে স্মৃতির ধুলোয়,  
সময় স্রোতের নতুন আলোয়,  
মুহূর্ত ও স্মৃতির মাঝে  
মন খারাপের অবকাশে -  
ফিরিয়ে দেবে রামধনু রঙ  
হারিয়ে যাওয়া কলেজ জীবন ॥

‘দুর্ভাগ্য তাদেরই, যাদের কোন প্রকৃত বন্ধু নেই।’

-অ্যারিস্টটল।

## বর্ষা

সুমন মণ্ডল

বি.কম. (অনার্স) প্রথম বর্ষ, বিভাগ-ক

## মনে পড়ে

অনীক বসু

বি.এস.সি. (অনার্স), প্রথম বর্ষ

বর্ষা এ তোমার কেমন রূপ ?

যাতে করে রবি ঠাকুর-ও মেতেছিল একদিন  
তোমার এই কালো মেঘের ঘনঘটায়  
আমরা সব দুঃখ হয়ে যায় বিলীন ।

বর্ষা এ তোমার কেমন শক্তি ?

যাতে করে নিষ্প্রাণ দেহেও তুমি প্রাণ সঞ্চার কর  
তোমার ওই অফুরন্ত বারিধারায়  
আমার শূন্য হৃদয় তুমি ভরো ।

বর্ষা এ তোমার কেমন লীলা ?

গ্রীষ্মের দাবদাহের পরেই তোমার আসা  
তোমার আগমনের পরেই কেন জেলেদের  
নীল নির্জন নদীর বুকে ভাসা ?

বর্ষা এ তুমি কেমন শক্তি, জানো ?

কোটি কোটি লোকের মুখে ফোটাও হাসি  
তোমার রূপ, শক্তি, লীলা, যাদুতে  
ধন্য ধন্য ধন্য হে পৃথিবীধাত্রী ।

অনেক উঁচু থেকে পৃথিবীটা দেখবো বলে  
মিনারে চড়তে গেলাম,  
টুকতে গেলেই রক্ষীয় কড়া নির্দেশ -  
নারী পুরুষ এক দরজায় নয় ।  
তফাত যাও ।

তোমার কপালে ফুটে উঠেছিল ঘাম  
মুখখানাও লাল,  
লজ্জায় ও অপমানে ।

হাতের মুঠোয় থাকা মিনারের টিকিটা দলা পাকিয়ে  
ছুঁড়ে মারলে রক্ষীয় মুখের উপর ।  
আমার হাত ধরে টেনে আনলে নদীর ঘাটে  
নৌকার মাঝি বললো - 'বাবু একসঙ্গে নয়  
একটু ছেড়ে ছেড়ে বসুন, নৌকাটা টলবে না ।  
তুমি বিলম্ব না করে নেমে এলে মাটিতে  
তারপর -

আমাকে নিয়ে হাঁটলে শীত ভোরের ঘন কুয়াশার মাঠে  
শিরীষ পাতায় ঝরে পড়া টুপটুপ শিশির ফোঁটায়  
ভিজলে, আমাকে ভেজালে চুপিচুপি  
আপদামস্তক অঙ্ককার ধুয়ে দেবে বলে ।  
দূরের মাঠে তখন পাকা-ধানের গুছি,  
আঁটি বাঁধতে বাঁধতে  
বৃদ্ধ চাষী অনন্ত বৈরাগী হাসিমুখে ডাক পাড়লো -  
'পেন্নাম হইগো, তোমরা আছো বলেই  
আজও আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামে  
আর ধরিত্তির ভরভরস্তু হয় চরাচর জুড়ে ।'

“মৈত্রী দ্বারা শত্রুকে জয় করবে, সাধুতার দ্বারা অসাধুকে  
জয় করবে, ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে ও নতের  
দ্বারা মিথ্যাকে জয় করবে।”

-বুদ্ধদেব।

## অনুভব

বন্দনা বসু ভৌমিক  
অধ্যাপিকা, ফিল্ম স্টাডিজ

চোখ বুজে অনুভব  
হলুদ ছবির মত  
বেল জুই মালতি টগর।

দমকা বাতাস খোলে  
অতীতের দরজারা।  
একদিন ছিল সাজঘর।

তাইতো ছাতিম গাছ  
সখা হয় নিয়মিত  
ইচ্ছেকে যেভাবেই চাই  
বৃষ্টিতে ভিজি আজ  
ছাতাদের ছুটি হোক  
ভালোলাগা মন খুঁজে পাই।

## Ageless

Saikat Pradhan  
B.A. English (Honours), 1st Year

I

I cannot call up my age  
At that specific time,  
When each extract of your tongue.  
I used to drink like wine.

Soft breeze was engineered.  
To billow your curly hair;  
And you did organize it  
With great care.

Honey, the eyes of ours  
Were two endless blue mystery,  
I saw you as a part of my soul,  
Never wanted to know your history.

II

Sweetheart, I commenced to consider you  
More than a general paramour.  
It seemed to me, was perceived by me.  
Each droplet of rain brought your odour.

Why your image in my mind is blurred now,  
I do not know,  
At present, you can be synonymous  
With a distant shadow.

Can you recall those joyous days ?  
When we did enjoy time in nimerous ways !  
Outside, the darkling clouds did roar a great,  
And we tasted love, lost in blanket !

The perfume of your physique  
Did tantalize me a lot,  
By every movement of your scarlet lips,  
My attention had invariably been caught.



The songs you sang, games you played for me,  
Did make me exersively dreamy,  
Your ample bosom was effulgent with health,  
Each moment I regard you my greatest wealth.

III

But the days are lost  
In the gloom of past.  
Every pleasure we had,  
All gossips we exchanged,  
Now appears like illusions.  
Were those gleewarm days just imaginary fushions ?  
Was the entire alchemy  
The deception of the time ?  
Am I pessimistic ? No, I should not be;  
I did not know properly,  
Who you were, what you were,  
But still I adore thee,  
To extreme degree.

IV

I am sure, I can ascertain;  
I was not temporarily crazy.  
It was eternal love,  
which had rendered me immortality.

---

You have to be burning with an idea, or a problem, or a wrong that you want to right. If you're not passionate enough from the start, you'll never stick it out.  
— Steve Jobs

# Proud Summer

Rima Naskar  
*B.A. English (Honours), 1st Year*

Oh ! my God,  
Very very hot  
Hot is in Summer.

Sweet popped out from the body of everyone,  
Birds are faint in the hot Sun of this season.  
Many vendors take rest in cooling shade of trees,  
Many road men become thirsty,  
All the summer round happend these ?  
Any children cannot play in the ground,  
I think summer is very very proud.

---

# The Street Lights

Sanchayan Khamaru  
*B.A. English (Honours), 1st Year*

In the enormous night  
I am walking alone  
with my little umbrella.  
But tonight, the stars are not sparkling.  
The moon is unable to send the silver light.  
The sky is crying in a violent way –  
But some thing is lighting the path.  
Oh ! It is the street lights.

The guspy winds are howling,  
But they are still shining.  
Till the morning comes to fight  
They will shine the whole night.

They will shine and give light  
And the world will be filled with light.

"Disability is a matter of perception. If you can do just one thing well, you're needed by someone"

– Martina Navratilova

# Success

Atrimay Saha

*B.Sc. Computer Science (Honours), 1st Year*

You tried your best to get it.  
Winning was just a little far from you.  
You were going to touch it...  
But unfortunately  
You lost in that game.  
Somebody else bare off the prize.  
From the next day,  
You looked pulled down...  
Because the defeat became a nightmarre for you.  
It haunted you in your dreams.  
You lost all of your confidence.  
You thought of not trying for it again !

Damm !  
You are an idiot...  
You have to come back,  
Know your capabilities and potentialities,  
and beat everyone in this game.  
Remember they called you 'looser'  
and now you are behaving like one !

Be the winner you once were,  
Don't lose confidence.  
Come on !  
The first step towards success is failure.  
So don't get depressed.  
Get on with your work.  
Carry yourself up !!  
And one day will come,  
When you'll get through it.  
Potentiality lies within you,  
and one day you'll be able to use the fullest  
of your capabilities.  
Break all Bonds, Break all Records  
Only then will you be called a  
Successful Person –

# Fibonacci Numbers in Nature

Sukanya Ghosh

Department of Botany, 2nd. Year

The **Fibonacci numbers** are the numbers in the following integer sequence, called the **Fibonacci Sequence**, and characterized by the fact that every number after the first two is the sum of the two preceding ones : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ..... These numbers were first identified by an Italian Mathematician Leonardo Pisano Bogollo, whose nickname was Fibonacci. The series was devised as a solution to the problem of how fast rabbits could reproduce in ideal circumstances.

The Fibonacci numbers are Nature's numbering system. They appear everywhere in Nature. Sunflowers have a Golden Spiral seed arrangement. This provides a biological advantage because it maximizes the number of seeds that can be packed into a seed head. In the case of tapered pinecones or pineapples, we see a double set of spirals – one going in a clockwise direction and one in the opposite direction. When these spirals are counted, the two sets are found to be adjacent Fibonacci numbers. The number of petals in most plants is also Fibonacci numbers. Branching pattern in the trees also follow this mysterious sequence. This design is perfect for accommodating all the new branches as well as to maximize the amount of sunlight available to all the branches; an evolutionary and mathematical level of precision that the trees thrive on. There is specific number of sections inside a fruit. Coincidentally, these sections also resemble the Fibonacci numbers.

The Golden Ratio is a special number which is obtained by dividing a line into two parts such that the larger part divided by the smaller part is equal to the whole length divided by the larger part. It is symbolized by using Phi ( $\phi$ ) and has a value of 1.618. The ratio between two successive Fibonacci numbers will eventually lead to the Golden Ratio. The Fibonacci numbers can be found even in our DNA. The DNA is a double helical structure which measure  $34\text{\AA}$  by  $21\text{\AA}$  which are Fibonacci numbers and their ratio is 1.619 which very close the the  $\phi$  value of 1.618.

Apparently, both the Fibonacci numbers and the Golden Ratio make up the Golden Rectangle. If you divide this rectangle into smaller and smaller rectangles, you'll end up with a spiral pattern, aptly named the Golden Spiral. The Golden Spiral are found all around us, be it in the plant kingdom, in animal kingdom, our environment and on a broader scale, in our galaxies. It is fascinating that how these numbers are found all around us and even within us at a micro level and in our galaxies at a macro level.

# শেষ অঞ্জলি

বিতান চন্দ্র ঘোষ

বি.এস.সি., পরিবেশ বিজ্ঞান (স্নাতক), প্রথম বর্ষ

ভাবতেও অবাঁক লাগে মনোজবাবুর যে, সেই ঘটনার একটা বছর কেটে গেল, আবার সেই বছর ঘুরে সরস্বতী পুজো। এই তো সেই সরস্বতী পুজো যে পুজোয় মনোজবাবুর সরস্বতী বিসর্জন হয়। এই সরস্বতী কোনো মাটির প্রতিমা নয়; এই সরস্বতী মনোজবাবুর চোখের তারা তার একটা মাত্র মেয়ে। হঠাৎই মনোজবাবুর চোখে ভেসে উঠলো সেদিনের ঘটনা। সেই বছর খানেক আগেও তো এই দিনে সকাল থেকে সরস্বতীর তোরজোড়। কখন সে পুজোর অঞ্জলি দেবে। মাহারা মেয়েটা সাত সকালে উঠে তৈরী হতে শুরু করে দিয়েছিল। মা মারা যাওয়ার পর মনোজবাবুর সম্বল বলতে ওই একজনই; গোটা ঘরের দায়িত্ব যেন ওই ছোট্ট মেয়েটার ওপরে এসে পড়েছিল আর মনোজবাবুও যেন তাকে অবলম্বন করে বাঁচতেন। ছোট ছেলের পড়াশোনা চালানোর জন্য একসময় সরস্বতীর পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে যায়। কিছু সরস্বতীর চোখের আশ্রয় আর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কোনোকিছুর সামনে কাবু হয়ে উঠতে পারেননি মনোজবাবু, একেই অনটনের সংসার তার ওপর দুজনের পড়াশোনা চালানোর মতো সামর্থ্য হয়ে উঠছিল না তার পক্ষে। তবুও মনোজবাবুর অক্ষমতাকে সরস্বতীর মানসিকতার কাছে হার মানতেই হয় সেদিন।

সেদিন থেকে সবস্বতী হয়তো ঠিক করে নিয়েছিল কিছু একটা করতেই হবে পড়াশোনার মাধ্যমে। প্রতি বছর পুরোনো বই আর কয়েকটা খাতার ওর সম্বল করেই পড়াশোনা। ঘরের সমস্ত কাজ করেও সে নিয়মিত স্কুলে যেত ও নিজেও নিয়মিত পঠন-পাঠনও করতো, আর ভাইকেও পড়াতো। বাবার সাথে সংসারের সামান্য অর্থগত সাহায্য করার জন্য রবিবার করে গ্রামের বুলা কর্মকারের বাড়ি ধূপকাঠি, বাঁশের দ্রব্য ইত্যাদি তৈরী করতে যেত। গ্রামের মেলার সময় বাদামভাজা, চিড়ে ভাজা বিক্রি করতে যেত। এত কিছু করেও একবারের জন্যও সে ক্লান্তি বোধ করেনি। সেদিনও সকাল সকাল ভাইকে তৈরী করে, স্কুলে পাঠিয়ে, মনোজবাবুর ফেরার অপেক্ষায় বসে আছে সরস্বতী। মনোজবাবু না ফিরলে সরস্বতীরও বের হওয়ার সুযোগ নেই। একেই তাদের বাড়ি গ্রামের এক নির্জন প্রান্তে আর ওদিকে বারান্দায় চারবস্তা ধান পড়ে আছে; এগুলো রেখে সে যায় কি করে। হঠাৎ বাইরে থেকে কারা যেন তাকে ডাকতে এল, সরস্বতী বাইরে এসে দেখলো তার বন্ধুরা ডাকতে এসেছে। কিন্তু তাদের পাঠিয়ে দেয় সে। এখান থেকে তাদের স্কুল - তাও এক ঘন্টার রাস্তা, তাই সেও আর তাদের সাথে যেতে পারে না। ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে হঠাৎই সরস্বতী মনে ভাবতে শুরু করে, আচ্ছা! মা যদি থাকতো হয়তো মা আমাকে তৈরী করে এতক্ষণে স্কুলে পাঠিয়ে দিত। হয়তো মা নিজের হলুদ শাড়িটা পড়িয়ে দিত আর সুন্দর করে বেণী করে দিত চুলে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে যে, যা হওয়ার নয় তা ভেবে লাভ কি, এভাবেই মনের দুঃখ চাপা দিয়ে রাখতো সে। হঠাৎই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। মনোজবাবুর বাড়ী আসার সময় এটা। তাড়াতাড়ি বাইরে থেকে ডাক আসে। এসে দেখে বাবার কাজের জায়গা থেকে এসেছে একটা লোক এবং বলে যে তার বাবার আসতে আজ দেরী হবে। কারণ না বলেই লোকটা চলে যায়, আর ঘরে ঢুকে সরস্বতী ভাবে যে, তার হয়তো এবছর

আর অঞ্জলি দেওয়া হবে না। কিন্তু এই জন্য সে একটুও দুঃখ পায় না, কারণ পূজোর অঞ্জলী দেওয়ার চাইতে তার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাবা। কারণ ঘরে এসে যদি মনোজবাবু ঘর ফাঁকা দেখে হয়তো না খেয়ে চলে যাবে আর এই করে গোটা দিনটা তার উপোসই কেটে যাবে। এই ভেবেই সরস্বতী গেল না। ঘড়িতে তখন বারোটা পেরোলো; স্নান সেরে সরস্বতী মনে মনে একবার মা সরস্বতীর নাম নেয় আর প্রার্থনা করে বলে, “এবছর তোমার অঞ্জলি হয়তো দিতে পারলাম না, তাও তুমি আমাকে অনেক আশীর্বাদ করো মা যাতে আমি আমার লক্ষ্য পূরণ করতে পারি।”

এই করে বেশ খানিকক্ষণ কেটে যায়। ঠক্ ঠক্!!! দরজার আওয়াজ, মনোজবাবু এসেছেন, ঘরে ঢুকে বাবাকে এত নিশ্চুপ থেকে সরস্বতী বিস্মিত হয়। ভাত বেড়ে বলে, “কি হয়েছে বাবা? বলো আমায়, নাকি তোমার শরীরর ভালো নেই... বলো।” এই শুনে কিছুক্ষণ মনোজবাবু চুপ করে থেকে কেঁদে ফেলেন। বলেন, “মা রে! আমার কাজটা চলে গেছে, এবার তোদের পড়াশোনা, ঘর কি করে চালাবো, তবে তুই এখন আমাদের বাঁচাতে পারিস বল মা? যা চাইবো দিবি? বল মা... বল?” সরস্বতীও দুঃখ পায় ও মৃদু স্বরে বলে ওঠে, “তুমি চাইবে আর আমি দেব না, বল?” মনোজ বাবু বলে ওঠে, “বিয়ে করতে হবে তোকে প্রসুনবাবুর সাথে”। সরস্বতী আর কিছু জানতে চায় না শুধু বলে..... “হ্যাঁ”! প্রসুনবাবু মনোজ বাবুর মালিক, প্রথমে স্ত্রী মারা যাওয়ায় সরস্বতীর ওপর তার আগাগোড়াই নজর ছিল, তাই মনোজবাবুর সারল্যের সুযোগ নিয়ে তিনি মনোজবাবুর মেয়েকে চেয়ে বসেন। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে মনোজবাবুর ছেলে বাড়ি ফেরে, ওদিকে সরস্বতীর কোনও চিহ্ন নেই। মনে ভাবে, “মেয়েটা কষ্ট পেয়েছে, মা হারা মেয়ে তো; আজ ওকে কিছু করতে দেব না, আমি আজ ওকে বেঁধে খাওয়াবো।” এই বলে মনোজবাবু তার ছোটো ছেলেকে রেখে মেয়েকে খুঁজতে বের হয়।

গ্রামের মন্দির থেকে প্রতিবেশীর কিছু বাড়ি দেখে তাকে খুঁজে না পেয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান মনোজবাবু। মনে মনে ভয় পান আর কিছুক্ষণ পড়ে বড়ো রাস্তা ধরে স্কুলের দিকে যেতে দৌড়ে আসা সরস্বতীর বন্ধু-বান্ধবীদের দেখেন। তারা যেন মনোজবাবুকে খুঁজতে আসছিল। তাদের কারোও মুখে ভয়, চোখে জল দেখে আতঙ্কিত মনোজবাবু তাদের পিছু নিতেই বড় রাস্তায় স্কুলের পাশে সরস্বতীর নিখর দেহ দেখে সাময়িক ভাবে মনোজবাবু পা থেকে মাটি সরে যায়। প্রাণবন্ত মেয়েটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে মাটিতে পড়ে যান। সরস্বতীর রক্তাক্ত মাথাটিকে কোলে তুলে কাঁদতে শুরু করেন, ডানহাতের মুষ্টিটি খুলে দেখেন কাগজের চিরকুট আর পাঁচশো টাকার তিনটে নোট। চিরকুটটি পড়তে শুরু করেন, লেখা আছে - “খুব স্বার্থপর হয়ে গেলাম তাই না বাবা? আমাকে ক্ষমা করে দিও, আর টাকাটা ধূপকাঠি তৈরী করে জমিয়েছি তোমাকে দেব বলে। তবে ভাবিনি এত তাড়াতাড়ি দিতে হবে, আমি চললাম মায়ের কাছে আর ভাইকে দেখে রেখ। আর যা আজ আমি করতে পারিনি; তা ভাইকে দিয়ে করিও আর খুব বড় কোরো, মানুষের মতো মানুষ কোরো ভাইকে; আমি আসি বাবা...”। সেদিন মনোজবাবুর কানে কেবলই সরস্বতীর ‘বাবা’ ডাকটা ভেসে আসছিল; দূরে যেন কেথায় হারিয়ে গেল সরস্বতী।

এদিকে স্কুলের অনুষ্ঠানে এবছর অষ্টম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকারী সরস্বতীর নাম ঘোষণা হচ্ছে আর অন্যদিকে মনোজবাবু সরস্বতীকে জড়িয়ে কাঁদছে।

# সরযেতে ভূত

সুমন মণ্ডল

বি.কম. (অনাস), প্রথম বর্ষ

১০ই এপ্রিল। ঘুরতে আসাই বলুন কিংবা কাজ করতে আসা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করতে আসা, এর জন্য ডুয়ার্স-এর মতো ভালো জায়গা আর হয়না। তাই চলে এলাম ডুয়ার্স-এ। এখানে আসা মাত্র এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ আমার মুগ্ধ করেছে। এখানে একটা গেস্ট হাউসে উঠেছি, গেস্ট হাউসটি ছোট, তবে বেশ পরিপাটি। এখানে আসার পর কয়েকজনের সাথে আমার অল্পবিস্তর আলাপ হয়েছে। প্রথম জন সুধীর চক্রবর্তী, ওনারই গেস্ট হাউস-এ আমি আছি। দ্বিতীয় জন হলেন স্টেশনমাস্টার বিমল দে। স্থানীয় ডাক্তার কমলেশ বসু ও স্থানীয় ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর বিশ্বাস। ভালোই দিন কাটছে। সকাল-বিকেল ঘুরতে বেরোই। দুপুরবেলাটা টেনে ঘুম দিই। রাত ৮টার পর খেয়ে দেয়ে বই পড়ি, ১০টার পর ঘুমোতে যাই। অরা হুঁয়া, আর একটা কাজ করি সেটা হল সন্ধ্যা বেলা সুধীরবাবুর বাড়িতে আড্ডা দিতে যাই। তাসের আসর জমে ভালো। একটা চাকরও রেখেছি, তার নাম সুরেশ। দিব্যি কয়েকটা দিন কাটল।

২০শে এপ্রিল। আজ একটা ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনাই বলব। বিছানায় শুয়ে আছি, ঘড়িতে তখন কত হবে সাড়ে ৬টা, প্রচন্ড গোলমালের আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, সুধীরবাবুর বাড়িতেই গন্ডগোলটা হচ্ছে। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে সুধীরবাবুর বাড়িতে গেলাম, সেখানে ইন্সপেক্টরবাবুর সাথে দেখা হল। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন সুধীরবাবুর বাড়িতে চুরি হয়েছে, লকারে রাখা নগদ আটলাখ টাকা ও তার সম্পত্তির উইল চুরি গেছে। কি করে হল বুঝতে পেরেছিলেন জিজ্ঞেস করতে বললেন, “সেইটি তো মশাই রহস্য”। শুভঙ্কর বাবুর মুখে যা শুনলাম তা হল যে, লকার না খুলেই নাকি লকারে রাখা জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেছে। তিনি বললেন আপনিই বলুন এমনটাও কি সম্ভব? আমি বললাম- প্রথমে হয়তো লকার খুলে সব চুরি করেছে তারপর আবার লকার বন্ধ করে দিয়েছে চোর। তিনি বললেন - হুঁ, তাও হতে পারে। কিন্তু আমি সুধীরবাবুকে বলেছি এ ব্যাপারে। তিনি বললেন, চাবি সবসময় তার বাড়ির একটা অতি গোপন জায়গায় থাকে। চোরের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব। চুরির পর চাবিটাও ওই একই জায়গায় রাখা ছিল।

এরপর আমি সুধীরবাবুর কাছে গেলাম। অত্যন্ত মুগ্ধে পড়েছেন ভদ্রলোক। বোধহয় কান্নাকাটি করেছেন। তিনি আমায় দেখলেন, কথা বললেন না, আমি বললাম, সুধীরবাবু আমি আপনাকে ক’টা প্রশ্ন করতে চাই। কথা দিচ্ছি, বেশী বিরক্ত করব না। সুধীরবাবু কথা না বলেই মাথা নাড়লেন। আমি বললাম - আচ্ছা আপনার চাকরটাকে কি রকম মনে হয়?

- ও চুরি করবে না, ছোটবেলা থেকেই আছে, অত্যন্ত বিশ্বাসী, আর তাছাড়া চাকর উইল চুরি করতে যাবে কেনো?

- আচ্ছা বুঝলাম, আপনার কারোর উপর সন্দেহ হয়? মানে পরিচিতদের মধ্যে?

- না।

- ঠিক আছে। আর আপনাকে বিরক্ত করব না, তবে আমি একটা অনুরোধ করব, রাখবেন?

- কি?

- আজ দিনটা শুধু আমি আপনার বাড়ি থাকতে চাই।

- তা তো ভালো কথা, আপনি আমার বাড়িতে থাকবেন - এই জন্য আবার অনুরোধ করার কি আছে? আপনি আমার অতিথি, যতদিন ইচ্ছা থাকুন।

- তা বেশ, তবে আমি একদিনই থাকব।

- আচ্ছা।

তারপর আমি রোজকার রুটিনের মতো বাইরে বেরোলাম। ঘুরলাম। ঠিক সন্ধ্যার পর আড্ডায় যোগ দিলাম। আজ আড্ডা ঠিক জমলো না। সাতটার মধ্যেই ভেঙ্গে গেল। আজ আমার সুধীরবাবুর বাড়িতে থাকার কথা। সুধীর বাবু ৯টায় ডিনার করেন, আমিও গেলাম ডিনার টেবিলে, কিন্তু খেতে গিয়েও বাঁধলো ঝামেলা। সুধীর বাবু একগাল ভাত মুখে তুলেই অসম্ভব ক্ষেপে গেলো। তারপর চাকরটিকে একেবারে গিলে নেবার মতো মুখভঙ্গি করে বললেন - আমি তরকারিতে বেশী ঝাল খাই না জানিস না?

- চাকরটিতো প্রথমে প্রায় খাবি খেল, তারপর চমক ভাঙতেই তড়িঘড়ি তরকারি নিয়ে ছুটলো রান্নাঘরে। এদিকে আবার সুধীরবাবু আবার আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন - কিছু মনে করবেন না মশাই। আসলে খাবারে একটু বেশী ঝাল হয়ে গেলেই আমার মাথা গরম হয়ে যায়, তার উপর আবার ওই চুরি, বুঝতেই তো পারছেন। কিন্তু আমি ওইসব কথা কানে নিচ্ছি না। এমনিতেই ৮টায় খেয়ে অভ্যাস। আর আজকে ৯টা বেজে গেল। তাই অসম্ভব ক্ষিঁদে পেয়েছে। শেষমেষ ১৫ মিনিটের খাবার একেবারে রাছর মতো সাড়ে সাত মিনিটে শেষ করে আমি বিছানা নিলাম।

২১শে এপ্রিল। সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গল সুধীরবাবুর ডাকে।

- কি, ঘুম হল? রাতে কোনো অসুবিধে হয়নি তো?

- না। তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। ইতিমধ্যে দেখি সুধীরবাবু দু-কাপ কফি নিয়ে এসেছেন। প্রথমে টের পাইনি। কফি খেতে খেতে আমি বললাম, তা আপনি এই চুরির ব্যাপারটা কিরকম নিচ্ছেন?

- কি আবার? অতগুলো টাকা চুরি গেল দুঃখ তো লাগেই। তবে ভাগ্য ভালো বেশীর ভাগ টাকাই ব্যাঙ্ক-এ রেখেছিলাম, তবে এখানে আর নয়, এবার সোজা জয়পুর চলে যাবো। সেখানেই স্থায়ী থাকার ব্যবস্থা করব, দশ পনেরো দিনের মধ্যেই...

- সেকি! এত গুলো টাকা চুরি গেল, আর আপনি সব ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলছেন?

- না, তা ঠিক নয়, পুলিশ তো তদন্ত করছেই, যদি কিনারা করতে পারে তো আমি তো খবর পাবোই।

- 'আচ্ছা' বলে আমি ওনার বাড়ি থেকে বিদায় নিলাম। এরপর থেকে আমার নাওয়া-খাওয়া সব ঘুচে গেল। দিনরাত আমি ওই চুরির ব্যাপারে ভাবতে লাগলাম।



২রা মে। এতদিন ডায়েরী না লেখার একটাই কারণ। হ্যাঁ আসলে কেসটা নিয়ে এতটাই মশগুল হয়ে পড়েছিলাম যে ডায়েরী লেখার সময় পাই নি। থাক সে কথা। তবে আজ আমি খুব খুশি, কারণ চুরির রহস্যভেদ করেছি অবশেষে। এই কদিনের টুকরো টুকরো অথচ মূল্যবান ঘটনাগুলোকে জোড়া লাগালে যেটা দাঁড়ায় তা হলো -

আজ প্রথমে পুলিশ নিয়ে গেলাম সুধীরবাবুর বাড়িতে। তিনি সবে গোজগাছ করে বেরোচ্ছিলেন বোধহয় জয়পুর যাওয়ার জন্যই রওনা দিচ্ছিলেন। আমাকে এবং ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর বাবুকে দেখে কিছুটা আশ্চর্যই হয়ে গেলেন প্রথমে। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন - কি ব্যাপার এই সময় আপনারা? আমি বললাম - হ্যাঁ বলছি, তবে আপনি আগে ব্যাগ ট্যাগ গুলি আবার ঘরে রেখে আসুন। মনে হয়না আপনার আর কোথাও যাওয়ার দরকার হবে। কারণ এই খবরটা দেওয়ার পর আপনার আর জয়পুর যাওয়া হবে কিনা বলতে পারছি না।

তিনি বললেন - কেন? চুরির কোনো কিনারা করতে পারলেন নাকি?

- হ্যাঁ, চুরির কিনারা করেছি এবং চোর ধরেছি।

- সেকি! কে সেই চোর?

- আপনি।

- মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল সুধীরবাবুর মুখ। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন - কি যা-তা বলছেন আপনি?

- ঠিকই বলছি, কিন্তু তার আগে আপনি বলুন তো আপনার ওই চাকরটা বেশি দিনের নয় তাই না?

- কি বলছেন? প্রথম দিনেই বলেছিলাম যে সে আমার কাছে ছোটবেলা থেকে আছে।

- আপনি মিথ্যে বলছেন।

শুভঙ্করবাবু আমাকে বললেন - আপনি কি করে জানলেন? আমি বললাম - সেদিন রাতে আমি যখন সুধীরবাবুর সাথে ডিনার করছিলাম তখন চাকরটি সুধীরবাবুর তরকারীতে ঝাল দিয়েছিল বলে, সুধীরবাবু বলেছিলেন যে তিনি তরকারীতে একদমই ঝাল খান না, যে চাকর তার কাছে ছোটবেলা থেকে আছে, তার এমন ভুল হয় কি করে?

সুধীরবাবু - মানলাম। কিন্তু এতে তো এটা প্রমাণ হয়না যে চুরিটা আমি করেছি।

- ঠিক তাই, এরপর আমি স্টেশন মাস্টার বিমল বাবুর কাছে যাই। আপনার জয়পুরের টিকিট কাটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে, তিনি বলেন যে আপনি জয়পুরের কোনো টিকিটই কাটেন নি। তারপর আমি তার কাছ থেকে আপনার পুরোনো চাকরের ঠিকানাটা নিই। আচ্ছা, তার আগে বলুন তো, লীলা দেবী কি সত্যিই আপনার স্ত্রী?

- হ্যাঁ, প্রথম স্বামী মারা যাওয়ার পর তার সাথে আমার বিয়ে হয়। কিন্তু এইসব প্রশ্ন এখন কেন?

- সব বলব।

- আচ্ছা আপনার স্ত্রী কি করে মারা যান?

- ওঁর দুটো কিডনিই ফেল করে।

- মিথ্যে কথা, আপনার স্ত্রী বিষক্রিয়ায় মারা যান।

- কি উল্টোপাল্টা বলছেন আপনি? আমার স্ত্রীর খবর আমার থেকে আপনি ভালো জানবেন?

- ঠিকই বলছি। আপনার পুরোনো চাকরের কাছ থেকে আপনার স্ত্রীর অসুখ চলাকালীন যে নার্স তার দেখাশোনা করছিলেন তার খোঁজ পাই। ওনার কাছেই জানতে পারি আপনার স্ত্রী বিষক্রিয়ায় মারা যান। তারপর আমাদের স্থানীয় ডাক্তার কমলেশ রসুর বাড়ি যাই। আপনার স্ত্রীকে তো উনিই দেখতেন তাই না? শুভঙ্করবাবুকে নিয়ে বেশ কয়েকবার কড়াপাকের জেরা করতেই সব সত্যিটা কবুল করল প্রায়।

- কিন্তু ডাক্তারও তো...

- জানি। এর সাথে যুক্ত। তারপর আপনার সম্পত্তি, খুরি, বলব আপনার স্ত্রী-এর সম্পত্তির যে উইল করেছিলেন সেই উকিলের বাড়ি যাই। জানতে পারি, আপনার স্ত্রী তার মোট সম্পত্তির ৮৫ ভাগ তার দুই ছেলের নামে লিখে দেন- তাই না?

- কিন্তু আমি...

- তাই আপনি একটা মিথ্যে চুরির ঘটনা রটিয়ে দিয়ে উইল ও নগট টাকা নিয়ে সরে পড়তে চাইছিলেন। পরে হয়ত আসতে আসতে সমস্ত সম্পত্তি বেচে দিতেন তাই তো? সেদিন যখন আমি আপনার বাড়িতে ছিলাম, লুকিয়ে আপনার নীল রঙের ডায়েরী থেকে আপনার দুই ছেলের ফোন নম্বর নিই। তারা দুজনেই জয়পুরে থেকে পড়াশুনা করে। তাদের সাথে কথা বলে যা জানতে পারি, তারা উইল সম্পর্কে কিছুই জানে না। আর এও বুঝতে পারি যে আপনি পৃথিবীর আর যেই প্রান্তেই যান না কেন জয়পুর মোটেই যাবেন না। ব্যাপারটা পরিস্কার হল, আপনি উইলের ব্যাপারটা আপনার সৎ ছেলেদের কাছে চেপে যেতে চেয়েছিলেন। আপনি আসলে লীলাদেবীকে তার সম্পত্তির জন্যই বিয়ে করেছিলেন। কি তাই তো? শ্রী নকুলেশ্বর ব্যানার্জী? দুজনেই হতবাক হয়ে যান, বিশেষ করে শুভঙ্করবাবু। তিনি বললেন এনার নাম নকুলেশ্বর ব্যানার্জী? তবে কি সুধীর চক্রবর্তী নয়? আমি বললাম - না। তিনি বললেন, আপনি কি করে জানলেন? আমি বললাম আজ থেকে একমাস আগে আমার সঙ্গে এক ট্রেনে লীলা দেবীর সাথে আমার দেখা হয়। তাকে আমি সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাই। তিনি চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন। তারপর ওনার সাথে আমার আলাপ হয়। তিনি আমায় ওনার জীবনের অনেক কথা বলেন। এও বলেন যে তাঁর হাতে আর বেশী সময় নেই। আমি যেন ডুয়ার্স-এ গিয়ে তাঁর স্বামী নকুলেশ্বর ব্যানার্জীর থেকে তার দুই ছেলের ফোন নম্বর নিয়ে তাদের এই উইলের কথাটা বলি। ওনার হাতে যে কেন বেশী সময় নেই বুঝি নি। তা সেই কাজ করতেই আমার এখানে আসা। তারপর এখানে এসে যখন জানতে পারি নকুলেশ্বর ব্যানার্জী সুধীর চক্রবর্তী ফেঁদে বসে আছে তখনই আমার মনে কেমন জানি সন্দেহ হয়। ওনার স্ত্রী আর বেঁচে নেই। এই একমাসের মধ্যেই কি এমন হল যে দিব্যি সুস্থ লীলাদেবী মারা গেলেন? তাই প্রথমে এসেই কিছু বলিনি, সমস্তটা চেপে যাই। পরে আস্তে আস্তে বুঝতে পারি সবটা। তাই পুরো দমে লেগে পড়েছিলাম তদন্তের কাজে, যেটা আমার কাজ।

- আপনার কাজ মানে? বুঝতে পারলাম না। প্রশ্ন করলেন শুভঙ্কর বাবু।

- আমি বললাম - যেটা করে আমি একা মানুষ নিজের পেট চালাই। ও আপনাদের তো বলতেই ভুলে গেছি, নমস্কার! আমার নাম শোভন রায়। প্রাইভেট ডিটেক্টিভ।

# কর্তব্য

শুভাশিস ব্যানার্জী

বি.এ., বাংলা (সাম্মানিক), প্রথম বর্ষ

আজ সকাল থেকেই শরীর খুব খারাপ গোপালবাবুর। তবু ডাক্তার দেখানোর কথা বললেই হাসতে হাসতে বলেন - ‘আমি সুস্থই আছি’। এত বয়স হল গোপালবাবু আজ পর্যন্ত নিজের কথা ভাবেননি কখনও। সারা জীবন শুধু অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন একমাত্র ছেলে রাখলকে ভালোভাবে মানুষ করবেন বলে। শুধু তাই নয়, তার স্ত্রী লীলাদেবীরও কোনও দাবি ছিল না স্বামীর কাছে। দুজনের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ছিল - রাখল।

গোপালবাবুর শরীরে বেশ কিছু জটিল রোগ রয়েছে, ছেলের পড়াশোনার খরচ রাখবেন বলে স্বল্প সঞ্চয়ের টাকায় হাত দেননি কখনও। যখনই খুব অসুস্থ হয়ে পড়তেন লীলাদেবী বলতেন - ‘এভালে চললে হয় না, নিজের শরীরের কথাও তো একটু ভাবো... তুমি যদি সুস্থ না থাকো আমাদের কী হবে! ...’ এসব কেবল চুপ করে শুনতেন গোপালবাবু, মাঝে মাঝে শান্ত স্বরে জবাব দিতেন - ‘মরে তো আর যাইনি বলা, ডাক্তার বলেছে এই রোগের চিকিৎসা করাতে অনেক খরচ। টাকার অভাব লীলা, আমি যদি এখন নিজের চিকিৎসার কথা ভাবি তবে ছেলেটার পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাবে... খোকা বড় হয়ে যখন চাকরী করবে তখন ও আমায় বড় জায়গায় ডাক্তার দেখাবে...’।

অভাবের সংসারে মানুষ হলেও অভাব কী জানত না রাখল। প্রত্যেকবার পুজোয় রাখলের বাবা-মা কিছু না কিনলেও, ছেলের জন্য নতুন জামা কিনে আনতেন। কোনও কোনও বছর যখন খুব অসুবিধা হত তখন ধার করতেন গোপাল বাবু, লীলা দেবী নিজের সোনার গয়না বন্ধক দিয়ে হলেও পুজোয় ছেলের নতুন জামা কিনতেন। ছেলের চোখের জ্বল তারা দেখতে পারতেন না। এভাবেই চলছিল, কেটে যাচ্ছিল বছর। তবে টাকার অভাবে রাখলের নিত্যনতুন আবদার ও সব চাহিদা পূরণ করেননি গোপাল বাবু।

যেদিন ছেলে চাকরী পেল, লীলাদেবী সেদিন নিজের চোখের জল ধরে রাখতে পারছিলেন না কিছুতেই, কেবল দু-হাত দিয়ে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছিলেন। আর রাখল-এর বাবার হাসিতে ফুটে উঠছিল সব পেয়ে যাওয়ার তৃপ্তির ছাপ। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে আনন্দেই দিন কাটছিল দুজনের। পুজোয় মা-কে দামী শাড়ী আর বাবাকে দামী পোষাক কিনে দিয়েছে রাখল। ছেলের উপার্জন করা টাকায় যেন সুখ-প্রাপ্তি হয়েছে দুজনের। কয়েক মাস পর যখন বাবা-মাকে নিয়ে ফ্ল্যাটে যেতে চাইল রাখল, নারাজ হল রাখলের বাবা। জন্মভিটে ছেড়ে কোথাও যেতে চান না জানিয়ে দিলেন ভালোভাবেই।

একদিন রাতের বেলা খাওয়ার সময় রাখল বলল - ‘মা, তোমাদের সাথে আমার কিছু কথা ছিল। আমি একজনকে ভালাবাসি আর তাকেই বিয়ে করতে চাই।’ রাখলের বাবা বলতেন - ‘বেশ তো, এতে তো আমাদের আপত্তির কিছু নেই। তবে ওকে একদিন নিয়ে আয় আমরা একটু দেখি।’ রাখল বলল - ‘বাবা, ও খুব বড় ঘরের মেয়ে, ও এখানে আসবে না, আমি তোমাদের তাই একটা ফ্ল্যাটে নিয়ে যেতে চেয়েছিলম... তবে ও খুব ভালো মেয়ে বাবা, ওর বাবা একটা দামী ফ্ল্যাট দেবেন, গাড়ী দেবেন...’ ছেলেকে থামিয়ে দিয়ে লীলাদেবী বললেন - ‘তার মানে তুই আমাদের

সাথে আর থাকবি না? ছেড়ে চলে যাবি আমাদের!' রাখল বলল - 'আমি কী তাই বলেছি মা? আমি তো প্রত্যেক সপ্তাহেই তোমাদের সাথে দেখা করতে আসব। প্রত্যেক মাসে তোমাদের টাকা পাঠিয়ে দেবো। তোমাদের কোনও সমস্যা হবে না দেখো মা... সামনের সপ্তাহে আমার বিয়ে মা, আমি আজ রাতেই বেরিয়ে পড়ব, বিয়ের পরে একদিন আসব দেখা করতে...'। চোখ ছলছল করে লীলাদেবী বললেন - 'মানে! আমরা...' থামিয়ে দিলেন গোপালবাবু।

বিয়ের দু-সপ্তাহ পর বাবা-মা-এর সাথে দেখা করতে এলেও সঙ্গে বউকে আনেনি রাখল। মা জানতে চাইলে বলেছে ওর শরীরটা খুব খারাপ মা, ও আসতে চাইছিল, আমিই বারণ করলাম...'। রাখলের মা সব বিশ্বাস করলেও, রাখলের বাবা সব বুঝেও চুপ করেছিলেন। রাখল ফোন-এ বিয়ের ফটো দেখালো, তারপরে মা-এর হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বলল - 'এটা রাখো মা, আর কোনো দরকার হলে আমাকে ফোন করবে, আমি এখন আসছি, এলাম বাবা'। এরপর থেকে কর্মব্যস্ত সন্তান আসার সময় না পেলেও নিয়ম করে প্রত্যেক মাসে মোটা টাকা পাঠিয়ে দিত বাবা-মাকে।

সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখ। ছেলেকে বারংবার ফোন করলেও তুলছিল না ফোনটা। শেষে একবার ফোনটা রিসিভ করেই বিরক্ত হয়ে বলল - 'কী হয়েছে কী! কতবার বলেছি অফিস টাইমে ফোন করে আমাকে ডিস্টার্ব করবে না, আমি ব্যস্ত থাকি, যা বলার পরে, আই মিন, রাতে বলবে...' রাখল এর মা শুধু বলল - 'একটা কথা বলেই রেখে দিতাম...' রাখল জানতে চাইল রাখলের মা বলল 'শুভ জন্মদিন খোকা, ভালো থাকিস তুই.. আজ একটু পায়ের স্নেহেছিলাম, সন্ধ্যা বেলায় একটু আসবি? জানিস খোকা ছোটবেলায় তুই পায়ের খাওয়ার জন্য...' রাখল বলল - 'হোয়াট! পায়ের? আর আজ সন্ধ্যাবেলা! জাস্ট ইমপসিবল্ মা। আজ আমার পার্টি আছে, অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। যেখানে-সেখানে টাইম ওয়েস্ট করলে চলবে না, এখন ফোন রাখছি, পরে কথা বলে নেব।'

এভাবেই সময় কেটে যাচ্ছিল। রাখলের বাবা আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তবু রাখলেকে কিছু বলতে বারণ করলেন। ব্যস্ত ছেলের বাবা-মাকে দেখতে আসা দূর কথা, ফোন করার সময় হয়ে ওঠে না। প্রত্যেক মাসে মোটা টাকার গন্ধে ভালো নেই তাঁরা, তাঁরা যে কেবল অর্থসুখ চাননি কখনও। এভাবেই চলছিল, হঠাৎ একদিন মারা গেলেন রাখলের বাবা। খবর পেই বড়লোক ছেলে বি.এম.ডব্লিউ নিয়ে এসে পা রাখলেন পিতৃগৃহে। শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। ছেলে অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিল এক আত্মীয় মারা গেছে বলে। নিয়ম মেনে নেড়াও হয়নি তাই। শোকে-দুঃখে পাথর হয়ে গিয়েছিল রাখলের মা। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কথা বলতেন না একদম, অস্বাভাবিক ব্যবহার করতেন। কয়েকটা কাজের লোক রেখে চলে গিয়েছিল রাখল, মায়ের যত্নের কথা ভেবে আরও বেশি টাকা পাঠাতো মাসে। সময়ে কেটে যাচ্ছিল, প্রত্যেক মাসে টাকা পাঠালেও খোঁজ নিতো না রাখল, ভাবতো মা ভালোই আছে। রাখলের বাবা মারা যাওয়ার পরের একমাস শুধু রাখলের পাঠানো টাকা কাজের লোক নিয়েছিল। তারপরে বহুদিন কেটে গেছে।

সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত রাখলের পাঠানো টাকা কে নিয়েছে কেউ জানে না, তবে ওই ঠিকানায় টাকা আসত প্রত্যেক মাসেই। এখন সেই পাড়ার বটতলায় এক বোবা পাগলী থাকে। কারা যেন বলে - 'ওই দেখ লীলাপাগলী আবার মাটি খাচ্ছে।'

# ক্ষুধা

গার্গী ভান্ডারী

বি.এ., সংস্কৃত (সাম্মানিক), প্রথম বর্ষ

ক্ষুধা... খিদের জ্বালা বড় জ্বালা। সে জ্বালা কি সওয়া যায়? - হ্যাঁ, সেই জ্বালার থাবাই নখর বসিয়েছিল রাস্তার ফুটপাতে পড়ে থাকা ভিখারিণীটির উদরে। সহ্যক্ষমতার উদ্যম বোধ এখনও পর্যন্ত জীবিত রেখেছিল রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, শীতে ঠক্ঠকিয়ে কেঁপে ওঠা সত্ত্বেও রাস্তায় পড়ে থাকতে বাধ্য থাকা ভিখারিণীটিকে। গায়ে একখানি ধুলো-ময়লা মাখা ছেঁড়া জামা ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করার সাহস দেখানো বোধহয় রাস্তা-চলা লোকজনের কাছে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু নয়।

তা-ও, মানুষের অন্তরে যদি মানবিকতার বালুকাচিহ্ন না থাকে, তবে মানুষকে আর মানুষ বলা কেন? রাস্তা ঘাটে বের হলে প্রায়শই নজর কাড়ে কম বেশি ঘটনা। সেদিনও তার বদল ঘটেনি। কলকাতার বুকে তো কম ভদ্রলোকের বাস নয়, তাও যে তারা কিভাবে স্বচ্ছন্দে অভদ্রতার পরিচয় দিয়ে যায় মুহূর্তে মুহূর্তে, তার রহস্য উন্মোচনকারী আমাকে যেন ভেবে ফেলোনা তোমরা। বাবু-সাবু সেজে, বুট পড়ে, গটমট পদক্ষেপে, চোখে সানগ্লাস কানে হেডফোন লাগিয়ে আমেজে এগিয়ে আসতে থাকা একটি বাবু-বেটা প্রায় লাথি মেরে চলে যায় ভিখারিণীটির মস্তক প্রান্তে। সাহেবী ভাষায়..“SORRY” বলা তো দূরের কথা, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বিড়বিড় করে, পথে পড়ে থাকা অসহায় মেয়েটির শতগুণ্টির নিয়ম বিহীন প্ল্যানচেস্ট করতে করতে নিজের রাস্তায় এগিয়ে চলল।

আমি তো নিজেকে তারপর ও ‘মানুষ’ বলে সম্বোধন করে চলেছি, কিন্তু বিশ্বাস করো তোমরা মেয়েটির বয়স ছিল বড়োজোড় সতেরো-আঠারো, একটি বাচ্চা মেয়ে... আমিও সেদিন গিয়ে মানবিকতা দেখাইনি। শুধুমাত্র দূর থেকেই মনে মনে আবেগ প্রকাশ করেছিলাম সযত্নে। আমিওতো একটা মেয়ে, তা সত্ত্বেও কিছু করতে পারিনি। নিজেকে অসহায় ভেবে বসেছিলাম। হঠাৎ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম নিঃস্বার্থ একটি চোখ-ফেটে-জল-আনা ঘটনা।

কথায় বলে না, - ‘রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি’। জোর আমি এই কথাটার উপর দিচ্ছি না, জোর একটি প্রশ্নের ওপর দিচ্ছি আমি - কাঙাল যদি আরেক কাঙালের বেদনা বুঝে, নিজেকে বিকিয়ে দিতে পিছপা না হয়, তবে রাজা আসলে কি বা কে?

‘খুচরো কটা পয়সায় খালি বাটিটাকে কিঞ্চিৎপূর্ণ করে, বনবান শব্দে বাটিটাকে ধরে নাড়াতে নাড়াতে ফুটপাত ধরে এগিয়ে আসতে থাকে ন-দশ বছরের একটি ছেলে। তার উদরেও ছিল ক্ষুধার ধারালো নখরের চিহ্ন, যার প্রমাণ, তার অসহায় দৃষ্টিটি। ছেলেটির পরনে ছিল একটি হাফ-প্যান্ট, যার আসল রঙটি উদ্ধার করা বোধহয় শুধু আমার কাছে নয়, সকলের কাছেই কষ্টসাধ্য, গায়ের সাদা জামাটা ছিল ধুলোর আমন্ত্রণ বার্তা। পায়ে একটি চটি জুতো পর্যন্ত লক্ষণীয়।

ছেলেটি বড়-জোর দশ-বারো টাকার খুচরা ভিক্ষার গ্রাহক, একবার হাতের বাটিটার দিকে, আর একবার ফুটপাতের এক পাশে বসে থাকা মেয়েটির দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে এসে বসল মেয়েটির পাশে। তারপর কি উঠে সামনের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। কিছুটা দূর এগোলে পরে, ভীড়ের মাঝে আর তাকে দেখতে পেলাম

না, দু-তিনবার পায়ের গোড়ালি তুলে তুলে দেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা-ও ব্যর্থ হলাম।

তারপর মনের মধ্যে থেকে কিছুক্ষণের অভিজ্ঞতাটিকে জীবন ইতিহাসের পাতায় মুড়তে থাকার প্রচেষ্টারত অবস্থায় গিয়ে বসলাম যাত্রীলয়ের একটি চেয়ারে। বাস আসতে তখনও আধ-ঘন্টা বাকী। সবেমাত্র বাড়িতে একটা ফোন করার কথা ভাবছি, হঠাৎ দেখি ছেলেটা হাতে একটা কাগজের খালায় কয়েক মুঠো ভাত নিয়ে, হনহন করে এগিয়ে এসে বসে পড়ল মেয়েটির পাশে। একবার মেয়েটির কাঁধ ঠেলা দিয়ে ডাকতে গিয়েও, থেমে গেল.. হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে কিনা ঠিক বলতে পারব না, তবে হ্যাঁ, উপরের দিকে তাকিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গিমা করে কি যেন একটা ভাবল। ভাবনার উপসংহার রচনা হতেই, আর এক-পলক দেবী না করেই থালা থেকে একটা ভাত তুলে নিজের চিবুকে লাগিয়ে দিল ছেলেটি। ব্যাস,... কাজ শেষ। এমন এক ভঙ্গিমা দেখিয়ে ছেলেটি কাঁধ-ঠেলা দিতে দিতে মেয়েটিকে ডেকে তুলল। - “দিদি... এ দিদি... এ নে খাবার নে এসিচি!” মরা ভাই-বোন। ছোট ভাইয়ের ডাকে সমস্ত যন্ত্রণাকে স্থগিত রেখে, নিজের সমস্ত শক্তিকে উৎসারণ করে ডান হাতের উপর ভর করে উঠে বসল ‘দিদি’।

- “কি খাবার এনিছিস্ ভাই।”

অসুস্থ স্বরে ভাইয়ের সম্বোধনকে প্রাণদান করে দিদি। দিগন্ত যেন ওত পেতে সারাটা দিন অপেক্ষার ভয়ের প্রহর গোনে, সূর্য কখন তার কোলে এসে ধরা দেবে, বাচ্চা ছেলেটিও যেন সারাটা দিন ভিক্ষার পর এই ‘ভাই’ ডাক শোনার আকাঙ্ক্ষার অবসান রচনা করল।

অসুস্থ দু-চোখে মায়ার আশ্ফালন ঘটিয়ে দিদি-ও যেন সেই কর্মঠ ভাইকে একটিবার বুকে জড়াতে চাইছিল, হয়তো অসুস্থতা - ইচ্ছের সাথে আকাঙ্ক্ষার মিলন ঘটাতে দেয়নি।

- “ভাত এনেচিস?”

- “হ্যাঁ... আনলুম তো! তুই খাবি তো!...নোঙরা পরবেনে?”

- “হ্যাঁ... দাঁড়া... খাচ্ছি!”

দিদি ভাতের খালা থেকে ভাত গালে তুলতে গিয়েও ভাত না খেয়ে ভাইকে একবার জিজ্ঞাসা করল, ... “তুই খেইচিস?” তারপর ভাইয়ের চিবুক লক্ষ্য করে মৃদু হাসতে হাসতে চিবুকে লেগে থাকা ভাতটিকে হাত দিয়ে ফেলে দিয়ে বলল “তোর পেট ভরেচে ভাই?”

সবটুকু ভাত খেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দিদি। যেন কতক্ষণের প্রতিকূলতাকে কয়েক মুহূর্তে জয় করে ফেলেছে ভাই-বোন। সারাটা দিন খেটে ভিক্ষা করে ভাইটি হাসতে হাসতে নিজের খালি থালকা পেটটাকে ভর্তি করে ফেলল কত সহজে। এ যেন ঈশ্বরের এক অলৌকিক লীলা, যার অনুভব চক্ষু নয়, হৃদয়ই করতে পারে। একটা ন-দশ বছরের বাচ্চা ছেলেও যে এত বড়ো বাস্তব অভিনেতা হতে পারে তা জানলাম। ইতিমধ্যে আমার গন্তব্যের বাস এসে গেল। আমি বাসে উঠে একটা জানলার পাশে সিটটা বসলাম। তখনও ওই দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আর কিছু কথা মনে হচ্ছিল। হয়ত বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে, আর মানুষও বিজ্ঞানের সাথে সাথে পা মিলিয়ে চলেছে, হয়ত পরে আরও উন্নত হবে। কিন্তু মানুষের প্রধান সম্পদ মানবিকতাবোধ তা কেড়ে নিচ্ছে। বিজ্ঞান সবকিছু তৈরী করতে পারলেও মন তৈরী করতে পারবে না, ভালোবাসা তৈরী করতে পারবে না।

আর এই জায়গাতেই বিজ্ঞানের হার সব সময়ের জন্য। কিছু মানুষ আছেন যাদের কাছে টাকা মানে শুধু বিলাসিতা, কিন্তু কিছু মানুষ এই টাকা না থাকার জন্য পেটে ক্ষিদের জ্বালায় গামছা বাঁধে।

আমরা কত গর্বের সাথে বলে থাকি আমরা উন্নত প্রাণী, আমরা মানুষ। সত্যি কি তাই? আমরা আসলে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা এক একটা মেশিন।

ওই ছোটো ভাইয়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা দিদির নিয়ে যায় ঘুমের দেশে। নিশ্চিন্তে ফুটপাতের পাশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকা দিদির কোলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে খিদে গোপন করা অসহায় ছোট ভাইটি.....।

## ভ্রমণ কাহিনী : মরুতীর্থ পুষ্কর

সায়ন দে

বি. এ., ইংরাজী (অনাস), দ্বিতীয় বর্ষ

“বিশ্ব ভুবন আমারে ডেকেছে ভাই,  
চার দেওয়ালের গন্ডি ছেড়ে তাইতো ছুটে যাই।”

ছোটবেলা থেকেই অচেনাকে চেনার এবং অজানাকে জানার ইচ্ছা আমার মধ্যে প্রবল। তাই আমি চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে মুক্ত পাখির মত নিজেকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু পড়াশোনার চাপে ও অন্যান্য কাজে তা সম্ভব হয় না। কিন্তু ভ্রমণ আমার নেশা, তাই বিশ্বপ্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতিবছর কোথাও না কোথাও ঘুরতে যাই। আমি পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র সব জায়গাতে গেলেও কোনোদিন মরু অঞ্চল যাইনি। তাই গতবারের আমাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আদর্শ মরুরাজ্য রাজস্থানকেই নির্বাচিত করা হয়েছিল। নতুন জায়গা দেখার জন্য আমার মন আনন্দিত করছিল এবং সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমার স্বপ্ন পূরণ হল। আমি, বাবা, মা, ভাই এবং দিদি সবাই মিলে একসঙ্গে রাজস্থান বেড়াতে গিয়েছিলাম।

রাজস্থানে দর্শনীয় স্থানের অভাব নেই। অসংখ্য কেল্লা, দুর্গ, রাজপ্রাসাদ - যা আমাদের মনের স্মৃতিতে চিরদিন উজ্জ্বল থাকবে। কিন্তু তাদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল রাজস্থানের পুষ্কর যা আমার সবথেকে ভাল লেগেছিল। সেই অভিজ্ঞতাটুকুই আমার এই ভ্রমণ কাহিনীতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। ভরতপুরের পাখিরালয় পার হয়ে গাড়ি যতই এগোতে লাগল ততই আরাবল্লী তার রুক্ষ-সুন্দর রূপে হাজির হতে লাগল। উঁচু নীচু কিন্তু চওড়া পথ। মাঝে মাঝে কাঁটাকাষোপ আর বিস্তৃত মরু প্রান্তর। এই প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত হচ্ছিল। জনবিরল রাস্তা এবং ধু-ধু প্রান্তর।

রাতের আলোয় আজমের শরিফ দর্শন করে পরদিন গেলাম ১৩ কিলোমিটার দূরে সেই বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান

পুষ্করে। ভারতে একমাত্র প্রজাপতি ব্রহ্মার মন্দির পুষ্করের নাম ও সৃষ্টি নিয়ে স্থানীয় মানুষ ও পূজারীদের মধ্যে এক বিশেষ গল্প প্রচলিত আছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর জন্য একটি তীর্থক্ষেত্র সৃষ্টি করার জন্য একটি পুষ্প মর্ত্যালোকে নিক্ষেপ করেন। সেই পুষ্প তিনটি জায়গায় পড়ে। সেই তিনটি স্থানই ব্রহ্মপুষ্কর, বিষ্ণুপুষ্কর ও রুদ্রপুষ্কর। এই তিনের মিলনক্ষেত্রই হল আজকের পুষ্কর। পুষ্কর ঘিরে ব্রহ্মা ছাড়াও আরও অনেক মন্দির আছে। মন্দিরসংলগ্ন সরোবরের তীরে দুপাশে দুটি পাহাড় দেখা যায় যাদের নাম ব্রহ্মার দুই স্ত্রীর নামে - সাবিত্রী ও গায়ত্রী।

পুষ্কর সরোবরে ব্রহ্মঘাট, বরাহঘাট, গোঘাট - এমন সব মিলিয়ে মোট ৫২টি ঘাট আছে। পুষ্করের মূল ব্রহ্মা মন্দির পাথরে গড়া। পাথরের সিঁড়ি পেরিয়ে হাজির হলাম মন্দিরে। রূপোর সিংহাসনে ব্রহ্মার মূর্তি। সিংহাসন ও মন্দির গাত্রের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিস্ময়কর। মন্দিরে প্রবেশের রাস্তা সরু হলেও ভক্তদের মধ্যে কোনো ঠেলাঠেলি বা তাড়াছড়ো নেই। মন্দিরসংলগ্ন অসংখ্য দোকান। সমুদ্রতল থেকে প্রায় ১৫০০ ফুট উঁচুতে এই পুষ্কর। সরোবরের চারিদিকে সবুজে আবৃত। রাজস্থানের এই রক্ষ উষর ভূমির মাঝখানে এত গাছ ভাবাই যায় না। সরোবরের শান্ত স্নিগ্ধ জলকে যেন প্রাণবন্ত রূপ দিয়েছে অসংখ্য মাছের খেলা। সরোবরের উপর উড়ছে প্রকৃতির রং তুলিতে রাঙানো অসংখ্য নাম না জানা পাখি।

তীর্থ দেখে ফেরার পথে চোখ পড়ল আনাসাগর ঝিল। দাঁড়াতেই হল সেখানে। নির্মল স্বপ্নে ভরা এই পুষ্কর মনের মধ্যে একটা প্রশান্তির রেশ রেখে দেয়। সত্যিই পুষ্কর এক মরুতীর্থ। আর এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতি সাক্ষী হয়ে থাকে আমার হাতের ছোট ক্যামেরাটিতে এবং তার সাথে আমার মনের খাতাতেও।

---

## **Hawking – A Non-Renewable Diamond Artist**

**Ahindra Kr. Biswas**

**Physics (Honours), 1st Year**

The man who had lived his life on the edge, questioning the boundaries of not just science but what his body can do. He was a British scientist, professor and author who was born on 8th January, 1942, which exactly coincides with 300th Galileo's death anniversary. Many of us know him as a physically challenged man who always used a wheelchair for locomotion and a computerised voice for speaking something. But only a few of us know that he was not in this disastrous condition from birth.

### **Hawking's Family and Early Years :**

He was born during the Second World War. He was not in a protective shield at all because at that time it was believed that the Germans started bombings the land of Britain. At that time Oxford was considered to be a safe area and so his parents alongwith him shifted to Oxford. He was the eldest son of Frank and Isobel Hawking. He was eccentric from childhood itself. He did not use to speak much on the dining



table. He used to spend maximum time with honeybees and to lit up greenhouse with fire. It was a fun to him as intelligence is creativity housing fun. His father was a Medical Researcher whose speciality was in Tropical Disease. As a father, he wanted him to excel in medical fields itself. But from childhood he was hypnotised to science and space. His mother know that very well and that's why during the nights of summer, she used to spend a lot of time with her children staring at the night sky and counting the stars and discussing about them.

### **Education :**

During the early years of his academic life he was a renowned student, but not exceptional at all. In fact, during the first year in St. Albar's school, he came third last in the class. But his mind used to work on other objects very sharply. He used to love board game. According to his friends, he developed a new game with them which they played among themselves. With the help of his friends, he had built a completely new computer by using the recycle parts which he used to solve complex mathematical equation. He joined Oxford University at the age of 17. He wanted to take up Maths but unfortunately at that time no specialised degree was there in the University and so he took up Physics and later dealt with cosmology. He completed Graduation in Natural Sciences in 1962 after which he went to Cambridge University to get a PhD. degree in Cosmology. Where he saved as a member of the Astronomy Unit from 1968 which gave him a new direction in his research. It is at this time when he started researching on Black Holes. He was included in the Royal Society, London in 1974. In 1979, he became the Lucasian Professor of Mathematics which is considered to be the highest post in Mathematics. Sir Issac Newton was the second chairperson of this post.

Hawking's fight with his disease. At the age of just 21, he became a prey to Amytropic Latual Sclerosis, a deadly neurological disease in which the nerve cells ceases to function with respect to time slowly. As a result of which the body goes in a paralysed state. While studying at Oxford, he often felt he was not 100% fit as he would often fall down suddenly while walking and he used to often stop many times while speaking. Despite trying, he couldn't speak further. Before 1983, he took these effects lightly and did not even share these with anybody. In 1983, when his father noticed his condition and took him to a doctor. After diagnosis, his father came to know he was suffering from ALS. Doctor's predicted that he would merely servive another 2½ years, but he experienced such strange things in hospital which turned his life's direction once again. In his hospital room another patient was suffering from leukaenia. He observed that the patient was bearing more pain than him. After somedays of his release from the hospital, he dreamt of death chasing him. That

dream made him to realize to do something as long as he is alive. This disease turned into a strength in his research because he himself told that his life was bonny until he was diagnosed. He dedicated the rest of his life to his research and science. As time passed by, he lost control over his body. By the end of 1979, he realised that he had lost the ability of walking. During the mid 70's he used to eat and drink on his own and all other jobs were done by his assistants who were his students. Later, the people who were familiar to him could only understand him what he was trying to speak. In 1985 due to Trachestopy, he lost his voice completely. His condition was so critical that he was kept under observation of nurses for 24 hours. Somehow he could escape death but now his body was 98% paralysed. At this time a software engineer from California built up a computer which could read Hawking's mind. Hawking just had to choose the words from computer which he wanted to speak out. After that the speech synthesizer used to convert those words into speech. At first his finger used to work and so with the help of hard held clicker he used to select these words. But later he used to direct those words with the help of a sensor attached to his cheeks.

### **His Important Theories and Contribution :**

He went through all physical and natural laws which govern the universe and concluded that the universe was started with Big Bang and so the death of universe will happen. Working with Roger Penrose he concluded that Einstein's Theory of Relativity suggest that time and space were born after the birth of Universe and it will end inside a Black Hole i.e. we have to write. General Theory of Relativity and Quantum Theory in order to understand the universe thoroughly, He gave us the concept of Quantum Radiation by which we came to know that, Black Holes Radiates Hawking's Radiation as a result of which its mass decreases with time. After this he was given a problem on Black Hole Paradox which he could not solve till his death. In 2014, he quoted :

"There are no Black Holes atleast in the way that cosmologists traditionally understand them". In this theory he included the concept of Event Horizon. He coined a new term "Appart Horizon" which altered itself due to the change in Quantum States of Bolt. But this theory was discarded as it was a massive controversial issue. He also told that Universe has no end and no Boundaries.

### **Books written by him :**

- 1) A Brief History of Time – From Big Bang to Black Holes in 1988.
- 2) The Universe in a nutshell in 2001.
- 3) A Briefer History of Time in 2005 which was a simplified and updated version of Brief History of Time and also included the "String Theory in Addition".

4) The Grand Design in 2010 where he said that God is not the creator of Universe.

“Because there is a law such as gravity, the Universe can and will create itself from nothing” his famous quote from this book.

“Success in creativity AI would be the biggest event in human history. Unfortunately it might also be the last, when we learn how to avoid the risks.”

– Hawkin on Artificial Intelligence

“If Aliens visit us, the outcome would be much as when Columbus landed in America, when didn't turn out well for the native Americans. We only have to look at ourselves to see how intelligent life might developed into something we wouldn't want to meet.”

“I think [contacting the alien civilization] would be a disaster. The extraterrestrials would be far in advance of us. The history of advanced vaas meeting more primitive people on this planet is not very happy and they were the same species. I think we should keep our heads low.”

– Hawkings on Aliens

This great men bid adieu to the world on 14th March, 2018, coincidentally on Einstein's birthday. His life tells us that hindrances can't stop you from reaching zenith, if you have the will power and self-belief within yourself. His life continues to inspire many abled and disabled people on the universe even after his death.

“A Tribute to a Great soul”

## মাতৃভাষায় বাঙালির অরুচি

শুভাশিস ব্যানার্জী

বাংলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ

“কীসের গরব ? কীসের আশা ?

আর চলে না বাংলা ভাষা

কবে যেন হয় ‘বেঙ্গলি ডে’

ফেব্রুয়ারি মাসে না ?”

(ভবানীপ্রসাদ মজুমদার)

কিছু বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হলেও, গুরুত্ব পায় না । এমনই একটি বিষয় নিয়েই আজ আমার কলমের শব্দখরচ । বাঙালি ‘বাংলা’ ভাষা নিয়ে আজ আর গর্ববোধ করে না, সত্যিই আমাদের মাতৃভাষা আজ অবহেলিত । অনেকেই বলবেন ‘আমি নয়’ । তবে শুনুন, এ লেখা আপনার জন্য নয়, আপনি হয়ত বলছেন - “বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি

আশা ?' তেমনই অনেকেই বলবেন না, এটাই তিঙ্ক সত্য ।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ J. R. Firth বলেছেন - 'As a first principle fix your faith to the mother tongue'

UNESCO সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন -

'The best medium for teaching is the mother tongue of the Pupil.'

মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম । মাতৃদুগ্ধ পান না করলে যেমন সন্তানের মধ্যে পুষ্টিতা আসে না, ঠিক তেমন মাতৃভাষা আয়ত্ত না করলে শিক্ষার্থীর শিক্ষায় পরিপুষ্টিতা হয় না, অন্তরাত্মা বা মানসিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে না । কিন্তু এখনকার চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন, আজ বর্তমানে এই সময়ে দাঁড়িয়ে বাঙালি 'বাঙলা' ভাষাটিকে চাকরি পাবার ক্ষেত্রে বাধা বলে মনে করে । অনেকেই ভুল বাংলা বলে ততটা লজ্জিত হয় না, যতটা তারা ভুল হিন্দী বা ইংরাজী বলে হয় । মাইকেল মধুসূদন দত্তও চলনে-বলনে-কথনে একেবারে খোদ ব্রিটিশ ছিলেন । কিন্তু পরে তিনি নিজেকে 'অবোধ' বলেছেন, বিদেশের পথে নিছকই ভিক্ষুক বলে ধিক্কার জানিয়ে নিজের কঠোর সমালোচনা করেছেন । কারণ তিনিও পরে বাংলা ভাষার স্বাদ পেয়েছিলেন । বাজারে কিন্তু মাতৃদুগ্ধের বিকল্প টিনজাত পানীয় আছে । তবে, তাতে মায়ের নাড়ির যোগ আছে? আমি যে ভাষাতেও মায়ের ভালবাসা-স্নেহ খুঁজি । হ্যাঁ আমি মাতৃভাষায় মায়ের টান খুঁজি, কবি কতটা সত্যি লিয়েছেন -

“বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠোনে ঝরে  
রোদ, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন । বাংলা ভাষা  
উচ্চারিত হলে অন্ধ বাউলের একতারা বাজে ।”

(সামসুর রহমান)

'সত্যি' তো মাপা যায় না, ভেবে দেখা যেতেই পারে । মায়ের ভাষায় ডুব দিয়ে ভাবুন ।

ইংরাজী মাধ্যমেই সন্তানকে পড়াতে হবে, তাই ব্যঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল । বাধ্যতামূলক ইংলিশ বললেই 'You are smart', ভুল বাংলা বললে সত্যিই অসুবিধা নেই ।

সত্যিইতো -

“কী লাভ বলুন বাংলা প'ড়ে ?  
বিমান ছেড়ে ঠেলায় চড়ে ?  
বেঙ্গলি 'থার্ড ল্যান্ডস্লেজ' তাই,  
তেমনি ভালবাসে না”

(ভবানীপ্রসাদ মজুমদার)

একটি শিশু একদলা মাটির মত, তাকে যেমনভাবে গড়া হবে সে তেমন রূপ পাবে - এ কথাটা ভীষণ সত্যি । শৈশবে একটি শিশু কিছুই বোঝেনা, শুনতে খারাপ লাগলেও বাবা-মায়ের দায়িত্বে অনেক খামতি থেকেই যায় । নিজের মাতৃভাষা না জানলে সে অন্য ভাষাকেও ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারবে না । নিজের মাতৃভাষাটা

ভালভাবে না জানা, বাংলা ভালভাবে না বলতে পারাটা লজ্জার, গর্বের বিষয় নয়।

অপূর্ব দত্ত লিখছেন -

“অ্যানুয়ালের রেজাল্ট হাতে বাড়ি ফিরল ছেলে  
মা বলল - কোন পেপারে কত নাম্বার পেলে ?  
হিস্তিতে মম, এইটি ফোর, ম্যাথসে নাইন জিরো  
মা বলল - ফ্যান্টাস্টিক, জাস্ট লাইক এ হিরো।  
সায়েন্সে ড্যাড, নট সো ফেয়ার, ওনলি সিক্সটি নাইন,  
ইংলিশে জাস্ট নাইনটি টু, অলটুগেদার ফাইন।  
জিয়োগ্রাফির পেরবে তো হান্ড্রেডে হান্ড্রেড  
ডুবিয়ে দিল বেংগলিটাই ভেরি পুয়োর গ্রেড।  
ছেলের মাথায় হাত রেখে মা ঠোট বেঁকিয়ে বলে -  
নেভার মাইন্ড, বেংগলিটা না শিখলেও চলে’

(‘বাংলা-টাংলা’-র কিছু অংশ)

এটা কি শুধুই কবিতা? আমার মতে, বর্তমান সমাজ চিত্র। সবসময় ইংরাজী ছবি, গান, আদব-কায়দা জানলেই ‘smart’ হওয়া যায় না। তাইতো প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে Airtel-এর বিজ্ঞাপনে বানান ভুল গুরুত্ব পায় না, নামী শপিং মলে ধুতি পরে যাওয়ার জন্য ঢুকতে দেওয়া হয় না বিখ্যাত পরিচালক-কে, কিন্তু ইংরাজীতে কথোপকথনের পরই সে শপিংমলে ঢুকতে পারে। ‘থার্ড ল্যান্ডসুয়েজ’-এর বইটিতেও একাধিকে ভুলে ভরা শিক্ষা পেলে, ভবিষ্যৎ-এর চিত্র সুস্পষ্ট নয় কি? অনেক বইতে তো জোর করে শেখানো হয় - ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দী। না সব বইতে ‘ছাপার ভুল’ বলবেন না প্লিজ। আসলে, আমরা অনেকেই জানি না ভারতবর্ষের নিদিষ্ট কোন রাষ্ট্রীয় ভাষা নেই।

প্রথাগতভাবে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত ইংরেজি ভাষাতেই ইংরেজদের হাত ধরে। তা বলে ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান!’ - বলে অনেকেই নাক সিটকান। বলছি জগদীশ চন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা এরকম অনেকের নাম নেওয়া যায় ও পাতার পরে পাতা লেখা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন -

‘যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান জানেন না’।

এই সময়ে একটি গান বোধহয় খুব প্রাসঙ্গিক -

“হায় বাঙালি হায়  
তুই আর বাঙালি নাই  
তোর চলন-বলন-কথার ধরন  
নিজের মত নাই’

(খরাজ মুখোপাধ্যায়)

তবে কি আমরা ইংরাজি জানব না? ভুল, জানতে হবে। কারণ, ইংরাজীর প্রয়োজন আছে। পোশাক পরব, ফিল্ম দেখব, গান শুনব সব ঠিক আছে, ইংরাজী ভাষা বা অন্য ভাষা জানারও প্রয়োজন আছে তবে তো নিজের মাতৃভাষাকে

অবহেলা করে নয়। একুশে ফেব্রুয়ারি কি শুধুই তারিখ? আমাদের গর্ববোধ করা উচিত দুই দেশের জাতীয় সংগীত আমার বাংলা ভাষায় রচিত। ওয়াল্টে 'Sweetest Language' হলেও সেই চাদরে ঢেকে রাখি না চিন্তা। কারণ, আমি আমার মায়ের ভাষাকে ভালবাসতে কারণ খুঁজি না। অন্য ভাষা জানব-শিখব, অন্য ভাষায় বই পড়ব। তবে, মাতৃভাষার স্থান ভুলে নয়। একটা সুদিনের আশা করছি, সেদিন সকল বাঙালি একসাথে বলব -

“মোদের গরব, মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা”

## Marxist Approach – Concepts of Class and Class Struggle কার্ল মার্কস - শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম

বাংলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ

সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে নানান দিক থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় - ভাষাগত, জাতিগত, ধর্মগত ইত্যাদি। তবে মার্কসবাদীদের মতে, সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য হল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। এই শ্রেণীগত বিভেদের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে শ্রেণীসংগ্রাম তৈরী হয়, তা সেই নির্দিষ্ট সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই শ্রেণীসংগ্রামই আবার সমাজপরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি চালিকা শক্তি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও মার্ক্সীয় মতবাদে শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে একথা ভাবা ঠিক নয় যে, শ্রেণীর ধারণাটি সম্পূর্ণ মার্ক্সীয় উত্থাপন নয়। মার্কস এঙ্গেলস্-এর আগে অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, যতো সনাতন ইংরেজ অর্থনীতিবিদরা তাদের আলোচনায় শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছিলেন, তাঁদের মতে সমাজে তিনটি শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় - পুঁজিপতি, জমিদার এবং শ্রমিক। এই তিনটি শ্রেণীর মানুষকে চেনা যায় তাদের আয়ের উৎস দেখে। যেমন পুঁজিপতিরা মুনাফা উপার্জন করে, জমিদাররা খাজনা ও শ্রমিকরা মজুরি আয় করে। অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো যদিও সমাজে এই তিনটি শ্রেণীর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু এদের মধ্যে কোন ধরনের সংঘাত বা সংগ্রামের কথা স্বীকার করেন না, তাঁদের মতে, সমাজের এই তিনটি শ্রেণীর অস্তিত্ব খুবই স্বাভাবিক।

এই ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের পাশাপাশি পুনঃ প্রতিষ্ঠা (Restoration) পর্বের একাধিক ফরাসী ঐতিহাসিক তিয়েরি (Thierry), গিজো (Guizot), মিনিয় (Mignet) সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। শুধু তাই নয়, এঁরা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার শ্রেণী সংগ্রামকেও চিহ্নিত করেন। এই তিন ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবকে সেই সময়কার ফরাসী সমাজের বিভিন্ন বিরোধী শ্রেণীগুলির মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের আলোকে বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু এর শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের ধারণাটিকে কেবল মাত্র ফরাসী বিপ্লবের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেছিলেন। বর্তমান সমাজের শ্রেণীকাঠামোর কোন আলোচনা এদের থেকে আমরা পাই না।

কার্ল মার্কস-ই সর্বপ্রথম সমাজে শ্রেণীর উদ্ভবের এবং শ্রেণীসংগ্রামের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন। মার্কস-এঙ্গেলস্ 'German Ideology', মার্কস 'Poverty of Philosophy'-তে, 'Capital'-এ, এঙ্গেলস্ তাঁর 'Anti-Duhring' ও 'The Origin of Family, Private property and the state' গ্রন্থে শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন। মার্ক্সীয় শ্রেণীর ধারণা সর্বপ্রথম বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শ্রেণী বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করেছে। উৎপাদনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি ও ভূমিকা মার্ক্সীয় দর্শনের একটি মূল বিষয়। মার্ক্সীয় মতানুসারে শ্রেণী হল ইতিহাসগতভাবে নিরূপিত একটি বর্গ যেটি উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশে একটি নির্দিষ্ট ফলশ্রুতি। মার্ক্সীয় মতানুসারে, মানব সমাজের একটি পর্যায়ে শ্রেণী গড়ে উঠেছে। আবার ভবিষ্যৎ-এ মানবসমাজ উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছোলে তার থেকে শ্রেণীর অস্তিত্ব মুছে যাবে। শ্রেণীকে মনুষ্যসমাজের একটি চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য বলে মার্ক্সবাদীরা মনে করেন। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের শ্রেণীকাঠামো পরিবর্তিত হবে এবং ভবিষ্যৎ-এ এক সময় শ্রেণীর অবসান ঘটবে। তাই মার্ক্সীয় শ্রেণীর ধারণার আমরা দ্বন্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রয়োগ লক্ষ্য করি।

যদিও মার্কস এঙ্গেলস্-এর মতবাদে শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের ধারণাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু শ্রেণীর সুসংগঠিত মার্ক্সীয় সংজ্ঞা আমরা সর্বপ্রথম পেয়েছি লেনিন-এর "Great Beginning" গ্রন্থে। লেনিন বলেছেন - "শ্রেণী বলতে বোঝায় সমাজের বৃহৎ গোষ্ঠীগুলি, যাদের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি হল এক ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদনব্যবস্থায় তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান, উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে তাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক, সামাজিক শ্রম সংগঠনে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা এবং তদনুযায়ী সামাজিক সম্পদে তাঁদের অংশ এবং এই অংশ আহরণপদ্ধতির মধ্যে। শ্রেণী বলতে বোঝায় সেই সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে যাদের মধ্যে এক গোষ্ঠীঅর্থনীতিতে নিজের অবস্থানের জোরে অপর কোন গোষ্ঠীর শ্রম আত্মসাৎ করতে সক্ষম।"

লেনিন-এর এই শ্রেণীর সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে দেখলে আমরা কেবল মাত্র সমাজের শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের কথা জানব না, শ্রেণীর উদ্ভবের পেছনেও কারণ আমরা জানতে পারব। মার্ক্সীয় মতানুসারে আদিম মনুষ্যসমাজে কোনো শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। সেই সময় উৎপাদনপদ্ধতি ছিল একেবারে অনুন্নত এবং এমন কোনো উৎপাদনের উপকরণ ছিল না যার ওপর কেউ ব্যক্তিগত মালিকানা দাবি করত, সমস্তটাই সমাজে ছিল সামাজিক মালিকানায়। ফলে সেই সমাজে কোন শ্রেণী বিভাজন ছিল না। পরবর্তীকালে উৎপাদনের উপকরণ ও পদ্ধতির উন্নতির সাথে সাথে সমাজে দেখা দিল ব্যক্তিগত মালিকানা। উন্নত উৎপাদনের উপকরণ ও উদ্ভূত উপকরণের ওপর সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ তাদের ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করল। এর ফলে সমাজ সম্পত্তির মালিক এবং সম্পত্তিহীন এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এর পরবর্তী সময় মনুষ্যসমাজব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার সত্ত্বেও এই ব্যক্তিগত মালিকানা বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটে না। ফলে সমাজে শ্রেণী বিভাজন থেকেই যায়।

মার্ক্সবাদীরা দাসসমাজব্যবস্থাকে সর্বপ্রথমে শ্রেণীবিভক্ত মনুষ্যসমাজ হিসাবে চিহ্নিত করেন। এর পরবর্তী সময় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী অস্তিত্বলাভ করা যায়। যে কোনো শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত মূল শ্রেণীগুলির মধ্যে শ্রেণী স্বার্থগত মৌলিক এবং চরম বিরোধ লাভ করা যায়। এর ফলে তাঁদের মধ্যে সংঘাত ও শ্রেণী সংগ্রাম অনিবার্য। যেমন - দাসসমাজব্যবস্থায় দাসমালিক ও দাসদের মধ্যে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসদের মধ্যে এবং পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম লক্ষ্য করা যায়। এই প্রত্যেকটি সমাজে উৎপাদনের উপকরণের মালিকশ্রেণী অর্থাৎ দাসমালিক, সামন্তপ্রভু এবং পুঁজিপতিরা তাদের মালিকানায় জোরে সম্পত্তিহীন শ্রেণীগুলির ওপর অত্যাচার, শাসন ও শোষণ চালিয়ে যায়। এই

অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শোষিত এবং নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষ শ্রেণীসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। পাশাপাশি উপকরণের মালিকশ্রেণীও তাদের মালিকানার আধিপত্য শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত হয়। তাই সমাজে দুইটি বিবাদ মাত্র মূল শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম অনিবার্য।

মার্ক্সবাদীদের মতে, এই শ্রেণী সংগ্রামের তিনটি রূপ আমরা লক্ষ্য করে থাকি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত। প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক সমাজের শোষিত শ্রেণীর মানুষ নিজেদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে মুক্ত হতে চায় এবং তার জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত হয়। যেমন - মজুরি বৃদ্ধি, কাজের সময় হ্রাস, বীমা সুরক্ষা, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরিষেবা ইত্যাদি দাবীদাওয়ায় শ্রমিকশ্রেণী তাদের আন্দোলন শুরু করে। তাই প্রথম পর্বে এদের আন্দোলন হয় অর্থনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাদের স্বার্থ রক্ষার গোষ্ঠী গড়ে তোলে এবং এর মধ্যে দিয়েই শ্রমিক ক্রমশ বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক সংগ্রামের স্বার্থে পরিচালিত হয়।

শ্রমিকদের এই অর্থনৈতিক আন্দোলন যখন মালিকপক্ষ তাদের হাতের দমনযন্ত্র রাষ্ট্রের সাহায্যে, পুলিশের সাহায্যে প্রতিহত করতে শুরু করে, রাষ্ট্রের মাধ্যমে পুঁজিপতি যখন শ্রমিককে নিগ্রহ করে, শ্রমিকশ্রেণী তখন বোঝে তাঁদের আন্দোলন শুধুমাত্র মালিকের বিরুদ্ধে নয় তা পরিচালনা করতে হবে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে। তখনই শ্রেণীসংগ্রাম তাঁর দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের পথে উন্নীত হয়।

শ্রেণী সংগ্রামের তৃতীয় রূপটি হল মতাদর্শগত। এই সংগ্রাম হল বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে মতাদর্শগতভাবে ক্রমে দাঁড়াবার সংগ্রাম। ভাবাদর্শ সংগ্রাম হল প্রোলেতারিয়েতের বিশ্বদৃষ্টি জাগ্রত করার সংগ্রাম। প্রোলেতারিয়েতকে মনুষ্য সমাজের সংগ্রাম সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং তাদের মধ্যে মানবতা বোধের মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার সংগ্রাম। এ হল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা তৈরী করার সংগ্রাম। সমাজে প্রচলিত শাসকশ্রেণীর মতাদর্শের বিরুদ্ধে সমাজের শোষিত, নিপীড়িত শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল বিকল্প মতাদর্শের প্রচলন শ্রেণী সংগ্রামের সাফল্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

মার্কস এঙ্গেলস্-এর মতে সমস্ত শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণীগুলির মধ্যে পুঁজিবাদী সমাজে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম সব থেকে প্রগতিশীল। আগেকার দাসসমাজ বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যে শ্রেণী সংগ্রাম দেখা যায় তার ফলে উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানায় হাতবদল হয়, অবসান হয় না। এর ফলে শোষণও অব্যাহত থাকে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা শোষক পুঁজিপতিদের হাত থেকে নিজের হাতে তুলে নেয়নি, তারা উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থারই হাতবদল ঘটাতে চেয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপকরণগুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন করা হয়েছে। মার্কস এঙ্গেলস্-এর অভিমত অনুসারে শ্রেণী সংগ্রামই হল মুক্তির একমাত্র হাতিয়ার। লেনিন-এর মতানুসারে, শ্রেণীসংগ্রামের মূল লক্ষ্যই হল প্রোলেতারিয়েত-এর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সর্বহারা শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে না। পূর্বতন পুঁজিপতি শ্রেণী ও তাদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের যতক্ষণ না সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ শ্রেণীসংগ্রাম অব্যাহত থাকে। তবে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটে। কিন্তু যতক্ষণ না সমাজ সাম্যবাদের স্তরে পৌঁছায় ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রেণীসংগ্রাম চলতে থাকে। যে কোন ধরনের বৈষম্যমূলক ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজ শ্রেণীসংগ্রাম থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। মার্কস এঙ্গেলস্-এর বিখ্যাত গ্রন্থ “কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো”-তে তাঁরা ঘোষণা করেছেন আজ পর্যন্ত সমস্ত মানবসমাজের ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।



# ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান

তীর্থরাজ সরকার

ইংরাজী (অনার্স), প্রথম বর্ষ

ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। ঋক্বেদিক যুগে ভারতীয় নারীরা পুরুষের সমতুল্য ছিল এবং পুরুষদের সঙ্গেই জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করার অধিকারী ছিল। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মতামত এবং আলোচনায় তাঁরা অংশগ্রহণ করতেন এবং নিজস্ব মতামত ও বিচার করার অধিকারও ছিল। সেই যুগের কয়েকজন মহীয়সী নারীরা হলেন - ঘোষা, অপালা, লোপামুদ্রা ইত্যাদি। কিন্তু ঋক্বেদিক যুগের অন্তিম পর্যায়ে নারীদের সামাজিক অবস্থানের ধীরে ধীরে অবনমন ঘটতে থাকে এবং মধ্যযুগে তা অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছায়। শুধু তাই নয়, নারীরা ক্রমশ পুরুষদের কাছে ভোগ্যপণ্যের বস্তু হিসাবে বিবেচিত হতে শুরু করে। ঋক্বেদিক যুগের নারীদের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন স্বভাৱ মধ্যযুগে সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।

সপ্তাদশ এবং অষ্টাদশ শতকেও নারীরা তাদের পরিবারের কাছে অবহেলিত হত। বাল্যবিবাহ ছিল চরম পর্যায়ে, প্রচলিত ছিল পর্দাপ্রথা, বিধবা নারীদের পুনরায় বিবাহ করার কোনো অধিকার ছিল না, তারা পুরোপুরি সামাজিকভাবে বঞ্চনার শিকার হতেন। শুধু তাই নয়, সতীদাহ-এর ন্যায় নিষ্ঠুর নির্মম প্রথারও প্রচলন ছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'নারীর মূল্য' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন,

“কিন্তু যে দেশে তখনও টোলে মহামহোপাধ্যায়েরা সাংখ্য, বেদান্ত পড়াইতেন, জন্মান্তর বিশ্বাস করতেন, কর্মফলে স্থাবর-জঙ্গম পশুজন্ম প্রচার করিতেন, দেবযান পিতৃযান প্রভৃতি পথের নির্দেশ করিতেন, তাঁহারা যে সত্যই বিশ্বাস করিতেন, পৃথিবীতে কর্মফল যাহা হউক, দুইটা প্রাণীকে একসঙ্গে বাঁধিয়া পোড়াইলে পরলোক বাস করে - একথা স্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন।”

কিন্তু ঊনবিংশ শতকে ভারতবর্ষে এক নবজাগরণের শুভ সূচনায় নারীরা তাদের ধুলুন্ডিত মর্যাদাকে আশু আশু ফিঁরে পেতে লাগলেন। সামাজিকভাবে তাঁদের মান-মর্যাদা ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। বিভিন্ন সমাজসেবী যথা রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাদেব গোবিন্দু রানাডে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ভারতীয় নারীরা এক নতুন আশার আলো পেলেন। নানারকম আইন প্রণয়ন যথা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্গ কর্তৃক Sati Abolition Act বা সতীদাহ প্রথা রদ আইন প্রণয়ন (১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে) এবং বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজের নিষ্ঠুর, পাশবিক প্রথা এবং কুসংস্কারের আইনত অবসান ঘটে (প্রকৃতপক্ষে সামাজিক স্তরে এর অবসান ঘটে আরো কিছু সময় পরে), এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন,

“লেকি সাহেব লিখিয়াছেন, এইপ্রথা ইংরাজেরা যখন তুলিয়া দেন, তখন টোলের পণ্ডিত সমাজ চেচামেচি করিয়া, সভা-সমিতি করিয়া, রাজা -রাজড়ার নিকট চাঁদা তুলিয়া বিলাত পর্যন্ত আপিল করিয়াছিল।”

প্রকৃতপক্ষে ইংরাজদের নবজ্ঞানের আলোকেই তৎকালীন মনীষীদের মধ্যে নতুন চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটে এবং তাঁরা নারীদের সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শুধুমাত্র তাই নয়, ভারতবর্ষ তাঁর স্বাধীনতা অর্জনের

জন্য শুধুমাত্র পুরুষদের কাছেই ঋণী নয়, নারীরাও সমউদ্দামে দেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তাঁদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এমন কয়েকজন মহান নারীরা হলেন ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সুলতান রাজিয়া প্রমুখ।

কিন্তু প্রতিটি মুদ্রার দুটি পিঠ থাকে। বিংশ শতকে এসে স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও পুরুষতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজে নারীদের সামাজিক অবস্থান পুরুষদের সমতুল্য হয়নি যা ঋক্বেদিক যুগে ছিল! এমনকি এখনো মহিলাদের 'পরায়া ধন' বা অপরের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমান সমাজের মানসিকতা ক্রমশ নীলগামী হয়ে যাচ্ছে। যদি কোনো মহিলা অফিসের কাজে অথবা গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাড়ির বাইরে যায় এবং বাড়ি আসতে দেরি হলে আমরা তাদের সন্দেহ করি। মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনাও বর্তমানে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, স্ত্রীলতাহানি, ধর্ষণ, বিবাহপণ নিয়ে পারিবারিক বিবাদ এমনকি মৃত্যু, অ্যাসিড ছোড়া এবং সর্বোপরি Cyber Crime! প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এবং টেলিভিশনে প্রচারিত এই সমস্ত ঘটনা মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে নাকি মানসিক নীচ করেছে - ইহা বলা অত্যন্ত কঠিন। নারীদের উপর যে অত্যাচার-এর পরিমাণ ক্রমবর্ধমান, তা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি প্রমাণ করে, যথা -

National Crime Records Bureau অনুযায়ী ভারতে প্রতি ৩ মিনিট অন্তর একটি নারীর সাথে অপরাধ সংঘটিত হয়।

International Men and Gender Equality Survey (IMAGES)-এর সমীক্ষা অনুসারে 24% ভারতীয় পুরুষ তাদের জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে নারীর উপর যৌন নির্যাতন করেছে।

National Commission for Women (NCW)-এর সমীক্ষা বলাছে 50% মহিলা কর্মক্ষেত্রে Gender Discrimination-এর শিকার। (এটি শুধু ভারতবর্ষেই নয়, একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। Google-এর সদরদপ্তরেও একটি সমপদস্থ পুরুষ ও মহিলা কর্মচারীর মধ্যে পুরুষ কর্মচারীর বেতন মহিলা কর্মচারীর তুলনায় বেশী, এই ঘটনা সুন্দর পিচাইকেও (CEO of Google) দুশ্চিন্তায় ফেলেছে)।

এইসব তথ্য জানার পর আমাদের মনে স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও আমাদের সমাজ এখনো নারীদের সমান সম্মান এবং মর্যাদার চোখে দেখতে শেখেনি।

এখন সবাই বলেন যে নারী এবং পুরুষ সমান, কিন্তু আদৌ তা নয়। একটি উদাহরণ দিই, একটি শিক্ষকের কাছে একটি ছাত্র পড়তে গেছে, সেই ছেলেটি কোনো কারণে শিক্ষককে পড়া দিতে না পারায় বা কিছু কাজ ভুল করায় শিক্ষক মহাশয় তাঁকে বকেছেন এবং মেরেছেন। ছেলেটি কিন্তু বাড়ি গিয়ে তার বাব-মাকে ওই বিষয়ে কিছু বলবেই না (ছেলেটির মনোভাব তখন - খুস্ বলে কী লাভ, আমিই ভুল করেছি ইত্যাদি)। কিন্তু ওই একই ঘটনা যখন একটি মেয়ের সাথে ঘটে তখন অধিকাংশ মেয়ের মানসিকতা - "স্যার একটা মেয়ের গায়ে হাত তুললেন...." ইত্যাদি এবং তার পরিবার পরিজন এসে শিক্ষকের সাথে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। প্রথমত, মাথায় রাখা উচিত একজন শিক্ষকের কাছে তাঁর সকল ছাত্র-ছাত্রী সমান (এইজন্য Student শব্দটি কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গের জন্য নয়, সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) এবং দ্বিতীয়ত, আমাদের মাথায় এমনকি স্বয়ং নারীদের মাথায় এমন একটি মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে যে নারী মানেই দুর্বল। প্রথমে এই ভ্রান্ত মানসিকতাকে দূর করতে হবে। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিই, অনেকেই বলেন যে ফুটবল ছেলেদের খেলা। কিন্তু ফিফা (FIFA) র‍্যাঙ্কিং-এ ভারতীয় মহিলা দলের র‍্যাঙ্কিং পুরুষ দলের তুলনায় অনেক ভালো। আরো একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হল আমির খানের 'দঙ্গল' সিনেমা। ওই সিনেমায় আমীর খান অর্থাৎ মহাবীর সিং ফোগাট এর বড় মেয়ে গীতা যখন প্রথম দঙ্গল লড়াইতে যাবে তখন তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একটি ছেলেকে নিবাচন করতে বলা হবে। ছেলেটিকে বাছার পর রেফারি ছেলেটিকে সতর্ক করে বলেন যে, "ছোরি হ্যায়, সম্বাকে লড়িও"। কিন্তু প্রত্যুত্তরে গীতা জানায়, "লেকিন ছোরি

সম্বন্ধে মত লড়িও”। এইরকম মানসিকতা নারীদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। এই চলচ্চিত্র বর্তমান ভারতীয় সমাজের নারীদের প্রতি মানসিকতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, “Rise and fall of a nation depends upon the rise and fall of its women”। এই কথাটি একেবারে বাস্তব সত্য। একটি সমাজের উন্নতি নারীজাতির উন্নতির উপরেই নির্ভর করে। আসলে আমরা নারী ও পুরুষ নিয়ে এতই ব্যস্ত যে আমরা মানুষ সেটা ভুলে যেতে বসেছি। সবার আগে আমরা মানুষ, তারপর নারী ও পুরুষ। নারী এবং পুরুষ সমতা আসবে যখন আমরা পুরুষকে সমান দৃষ্টিতে বিবেচনা করব এবং এর জন্য যুব সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে।

## বিরহের কাব্য মেঘদূতম্

মণীষা মণ্ডল

সংস্কৃত বিভাগ, প্রথম বর্ষ

“কবির কবে কোন বিস্মৃত বরষে  
কোন পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে  
লিখেছিলেন মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক  
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক  
রাখিয়াছে আপন আঁধারে স্তরে স্তরে...”

সংস্কৃত সাহিত্যের আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র কবি কালিদাস রচিত “মেঘদূতম্” এই গীতিকাব্যকে স্মরণ করে এই কবিতাটি লিখেছেন উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ। বিরহ মানুষের হৃদয়ে মেঘের মতো ধীর গতিতে বয়ে চলে। কালিদাস মন্দগতি মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিশ্বের বিরহীদের শোক পুঞ্জীভূত করেছেন এই গীতিকাব্যে। যা আষাঢ়ের নবঘনের পদসঞ্চারণে উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

প্রেমের দুই প্রান্ত মিলন ও বিচ্ছেদ। সংস্কৃত অংলকারিকদের ভাষায় সন্তোগ ও বিপ্রলম্ব। মিলনের সুখেই বিচ্ছেদের বেদনা সুপ্ত থাকে আবার বিচ্ছেদের হোমানলে জেগে ওঠে মিলনের আর্তি। যে কলাকৌশলে এই দুইপ্রান্ত এক হয়ে যায় তা হল প্রেমবৈচিত্র। কোনো এক যক্ষকে উপলক্ষ্য করে কবি তার মুখে প্রেমিক হৃদয়ের মিলন বিরহের অনুভূতিকে বিশ্বমাঝারে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই কাব্যে যক্ষের কোনো প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়নি। শুধু কর্তব্যে অবহেলার জন্য প্রভু কুবেরের অভিশাপে যক্ষকে একবছরের জন্য পত্নী বিরহিত জীবন যাপন করতে হয় রামগিরি পর্বতে - এই একটি পঙ্ক্তিতেই গল্প শেষ। যার রেশ ছড়িয়ে আছে সমগ্র কাব্যে।

“কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ  
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ।  
যক্ষশচক্রে জনকতনয়ান্নানপুণ্যোদকেষু  
স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুণু বসতিং রামতীর্থাশ্রমেণু।।”

প্রভুর অভিষাপে সে ‘অস্তংগমিতমহিমা’ অর্থাৎ সে তার অভিশপ্ত জীবন সকল অলৌকিক শক্তি থেকে বঞ্চিত। ‘আশ্রমেষ্’ এই বহুবচনের প্রয়োগও লক্ষণীয়। বিরহাৰ্ত হৃদয় কোথাও গিয়ে শান্তি পায় না, তাই তাকে এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে বাসাবদল করতে হয়। অবশেষে রাম ও সীতার পুণ্য প্রেমস্মৃতি বিজড়িত রামগিরি পাহাড় সেখানে সে দিনযাপন করতে থাকে।

সুখী ব্যক্তির হৃদয়ও মেঘ দেখে আন্দোলিত হয়। আর যার প্রিয়া দূরে রয়েছে তার তো কথাই নেই। তাই শৈলকূটের আলিঙ্গনে আবদ্ধ মত্ত হাতীর মতো একখন্ড মেঘ দেখে যক্ষের হৃদয়ও চঞ্চল হয়েছিল। অচেতন মেঘকেই যক্ষ বার্তাবহ করে তার প্রিয়ার কাছে পাঠতে চাইল। যক্ষের অনুরোধ ছিল সে যেন তার প্রিয়াকে ভাতৃজায়া মনে করে তার বার্তা নিয়ে যায়। যে পথ দিয়ে সে যাবে কবি সেই পথের বর্ণনা করেছেন কাব্যের পূর্বমেঘ অংশে। পূর্বমেঘ শুধু পথের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, প্রয়াণের সেই পথেরখায় ছড়িয়ে গিয়েছে কামনার ফল্গুধারা যার শেষে আছে মেঘের গন্তব্যস্থল কৈলাস পাহাড়ের কোলে কামনার মোক্ষধাম অলকাপুরী। কাব্যের উত্তরমেঘ অংশে রয়েছে সৌন্দর্য ও মাধুর্যের লীলানিকেতন এই অলকাপুরীর। কাব্যের উত্তরমেঘ অংশে রয়েছে সৌন্দর্য ও মাধুর্যের লীলানিকেতন এই অলকাপুরীর বর্ণনা যার কোনো ভৌগোলিক অস্তিত্ব নেই, মিলনেচ্ছু মানুষের স্বকল্পলোকেই তার স্থান। ধনপতি কুবেরের রাজধানী হল অলকা, “আনন্দোক্ষং নয়নসলীলং যত্র নান্যে নিমিত্তেঃ”, যেখানে ধনপতিদের চোখে আনন্দের কারণেই জল আসে অন্য কারণে নয়। “নাপ্যান্যস্মাৎ প্রণয়কলহাৎ বিপ্রয়োগোপপত্তিঃ” প্রণয়কলহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুই বিচ্ছেদ ঘটায় না। “ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদন্তি” যৌবনের উর্দ্ধে অন্য কোনো বয়সও নেই, এককথায় যেখানে শুধুই যৌবন শুধুই প্রেম শুধুই আনন্দ।

বিচ্ছেদের দ্বারাই মিলনের পরিপূষ্টি। তাই বিরহ কবিদের চির আদরণীয় বিষয়। “মেঘদূতম্”-এর মতো অন্যান্য সাহিত্যেও কবিরা বিরহের জয়গান করেছেন - যৌবন তাঁকে মেঘলাদিনে পাতাঝরা গাছের নীচে নিয়ে এল। ব্যথায় পতিত হয়ে মুক্তি চাইলেন যৌবন উত্তর দিল “দাঁড়াও হৃদয় বেদনার মধ্য দিয়েই জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হয়।” এমন সময় জিউস কন্যা মেলপোমেন এসে হাত দিয়ে তাঁর চোখ ঢেকে দিলেন। লেখক বললেন - “এ কে?” উত্তর হল, “বিরহের দেবী”। শঙ্কিত হয়ে তিনি শুধালেন “বিচ্ছেদের কী প্রয়োজন?” দেবী তখন হাত সরিয়ে নিলেন। দেখা গেল যৌবন লেখকের অঙ্গবাস কেড়ে নিয়ে চলে গিয়েছে আর যাবার সময় বলে গিয়েছে এই দেবীই তাকে দেখাবেন পৃথিবীর অশ্রুসাগর। অশ্রুর অন্তরে গিয়েই অমৃত উদ্ধার করা চলে, অন্য কোনো প্রকারে নয়, দুঃখের অনন্ত রাজ্য ঘুরিয়ে শেষে বিচ্ছেদের দেবী তাকে আশ্বস্ত করলেন - “This is night, but wait morning will soon be here”

‘মেঘদূতম্’ কাব্যে বিরহের মধ্য দিয়েই মিলনের মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছে। যক্ষের বিরহ কোনো সুদীর্ঘ ব্যাপার নয়, মাত্র একটি বছর। তারপর মিলনের নিশ্চিত আশ্বাস তো আছেই। তবুও অচেতন মেঘের কাছে বিরহী যক্ষ যে পথের বর্ণনা দিয়েছে তার প্রতিটি চরণেই মিলনের আর্তি ফুটে উঠেছে। তাই জগতের যত বিরহী তাদের সকলের মনোবেদনা যক্ষের বার্তালাপে প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত কালিদাস এই কাব্যে যক্ষের বিরহের মধ্যে একটি বিশ্বজনীন বিরহের ব্যঞ্জনা ব্যুৎ করেছেন - যা সব দেশকালের গন্ডিকে অতিক্রম করেছে। রবীন্দ্রনাথ ‘বিরহ’-কে ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে - “মানুষ এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। দুজন পাশাপাশি থাকলেও মানসলোকে তাদের পরস্পরের মধ্যে থাকে এক দুস্তর ব্যবধান - একটি অশ্রুসিক্ত সমুদ্র।” প্রত্যেক মানুষের এই যে অতলস্পর্শ বিরহ- কবি একেই চিত্রিত করেছেন তাঁর কাব্যে। শুধু তাই নয় চির আনন্দমুখর অলকাপুরীতেই হবে এই বিরহের অবসান, এমন আশাও প্রকাশ করেছেন।

# STUDENTS' UNION 2017

## President

Dr. Tapan Kumar Poddar (Principal)

## Vice President

Sujoy Sarkar

## General Secretary

Soumyajit Chail

## Assistant General Secretary

Sayan Halder

## Cultural Secretary

Rahul Sarkar

## Assistant Cultural Secretary

Biplab Kumar Patra

Subhanil Patra

## Games & Sports Secretary (Outdoor)

Sanjay Chakraborty

## Assistant Games & Sports Secretary (Outdoor)

Rana Das

Asmit Chakraborty

Snehasish Saha

Chandan Dewan

## Games & Sports Secretary Secretary (Indoor)

Pratap Bag

## Assistant Games & Sports Secretary Secretary (Indoor)

Akash Show

Amiya Pramanik

Kuntal Bala

Barun Das

## Treasurer

Dibyendu Roy Safai

## Students Welfare & Social Service Secretary

Tania Das

## Assistant Students Welfare & Social Service Secretary

Ritika Pramanik

Anamika Halder

Sabyasachi Santra

## Magazine & Wallpaper Secretary

Sovan Naskar

## Assistant Magazine & Wallpaper Secretary

Sucharita Dey

## Library Secretary

Suman Maity

## Assistant Library Secretary

Sandipan Roy

## Commonroom Secretary (Boys)

Apurba Biswas

## Assistant Commonroom Secretary (Boys)

Subhaditya Mukherjee

Indranil Barman

## Commonroom Secretary (Girls)

Suparna Naskar

## Assistant Commonroom Secretary (Girls)

Oindrila Debdas

## Seminar Secretary

Sourav Mondal

## Assistant Seminar Secretary

Ikbal Mondal

## Canteen Secretary

Subhajit Dey

## Assistant Canteen Secretary

Kunal Das

## Book Bank Secretary

Subhasis Sadhukhan

## Assistant Book Bank Secretary

Subhankar Halder



Members of Students' Union